জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক ত্রৈমাসিক

নবীন বিজ্ঞানী

মার্চ, ২০২০

- নক্ষত্রের জীবন
- Illegal Hilsha Extraction: Technology Is the solution
- জিনপ্রযুক্তির যত চমক
- ঘরের বাতাস বিশুদ্ধকারী গাছ

প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০২০

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী
মার্চ, ২০২০ সংখ্যা

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী
সুকল্যাণ বাছাড়
কিউরেটর

মো. কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার

মো. আনিসুর রহমান
কিউরেটর (চ.দা.)

মো. মাসুদুর রহমান
সহকারী কিউরেটর

মো. মুমিনুর রশীদ
সহকারী কিউরেটর

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
সিনিয়র আর্টিস্ট কাম-অডিও
ভিজ্যুয়াল অফিসার

রবিন বসাক
আর্টিস্ট

অলংকরণ/মুদ্রণালয়
অ আ প্রিন্টার্স
বাসা ৯৫, রোড ৪, দক্ষিণ বিশিল
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ০২-৫৮১৬০৬০৯
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nmst.gov.bd

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০২০

সূচিপত্র

- নক্ষত্রের জীবন ১
  – ড. সালেহ্ হাসান নকীব
- Illegal Hilsha Extraction : Technology is the Solution ১০
  – Muhammad Munir Chowdhury
- ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ও নামকরণ ১৩
  – জহুরুল হক বুলবুল
- বাংলাদেশি বিজ্ঞানী এবং তাঁদের আবিষ্কার ১৭
  – ড. ইসতিয়াক মইন সৈয়দ
- জিনপ্রযুক্তির যত চমক ৩০
  – ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
- ঘরের বাতাস বিশুদ্ধকারী কিছু গাছ ৩৭
  – আমিনা বেগম

‘নবীন বিজ্ঞানী’-এর নিয়মাবলি

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে লেখা হতে পারে, তবে নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে। আর ভাষা সহজ-সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অনির্বাচিত লেখা ফেরত দেওয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- লেখার সঙ্গে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছবি দিতে হবে এবং সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চায়নিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নন।
- মুদ্রণের জন্য অনুমোদিত লেখা কম্পোজ করে সংশোধনের জন্য লেখকের কাছে পাঠানো হবে।

প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক
নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৫৮১৬০৬০৯
ই-মেইল : infonmst@gmail.com, dg@nmst.gov.bd
facebook : www.facebook.com/nmstbdpg/

নবীন বিজ্ঞানী-তে বিজ্ঞাপন দিতে হলে উল্লিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মহাপরিচালকের বাণী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়সমূহ শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষণীয় ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে এ সংস্থা নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'নবীন বিজ্ঞানী' প্রকাশ করছে। একটি বিজ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠনে চাই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা। বিজ্ঞান অনুরাগী জাতি গঠনে প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে অর্ধশতাব্দী কালেরও বেশি সময় বিজ্ঞান জাদুঘর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ প্রকাশনার লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মের বিজ্ঞান ভাবনাকে শাণিত করা। এতে প্রকাশিত ৬টি প্রবন্ধ শিক্ষার্থী ও আগ্রহীদের বিজ্ঞানচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে, এ প্রত্যাশা আমাদের। যেসব লেখক ও বিজ্ঞানী এ প্রকাশনাকে লেখনী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এ প্রকাশনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের যেসব সহকর্মী শ্রম, মেধা ও সময় দিয়েছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সকলের মেধা, শ্রম, মনন ও প্রজ্ঞার ফসল ত্রৈমাসিক এ 'নবীন বিজ্ঞানী' প্রকাশনা।

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নক্ষত্রের জীবন

ড. সালেহ্ হাসান নকীব

রাতের আকাশে দৃশ্যমান অনন্ত নক্ষত্রবীথি স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এর অপার সৌন্দর্য কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের ভাবিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র, সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্য নিজেই যে একটি নক্ষত্র বা তারা, তা বুঝতে মানুষের সময় লেগেছে।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras) ধারণা করেন, অন্যান্য তারার মতো সূর্যও একটি নক্ষত্র। অ্যানাক্সাগোরাস অবশ্য মনে করতেন নক্ষত্রগুলো হচ্ছে আগুনে মোড়া বিশাল সব পাথুরে খণ্ড। একেকটির ব্যাস কয়েক শ মাইলের মতো। অ্যানাক্সাগোরাসের এই ধারণা সেকালে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। এর প্রায় দুই হাজার বছর পর গ্যালিলিও ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস বিভিন্ন ভক্ত-উপাস্তের মাধ্যমে সূর্যের নক্ষত্র পরিচয়টি সবার সামনে নিয়ে আসেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিজ্ঞানী মহল সূর্যকে একটি নক্ষত্র বলে মেনে নিয়েছেন।

পাঠ্যপুস্তকে নক্ষত্রগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন সব মহাজাগতিক বস্তু পিণ্ড হিসেবে, যাদের আলো দেওয়ার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ তারাগুলো কোটি কোটি বছর ধরে আলোক শক্তি উৎপাদন করে যেতে পারে। অন্যদিকে পৃথিবী বা চাঁদের মতো গ্রহ-উপগ্রহগুলো তারার আলোয় আলোকিত হয়। এদের নিজেদের আলোক শক্তি তৈরির ক্ষমতা নেই। এই তারা বা নক্ষত্রগুলো এলো কোথা থেকে? মহাবিশ্বের শুরু থেকেই কি এরা ছিল? প্রাচীনকালে ধারণা করা হতো, মহাবিশ্বের শুরু থেকেই তারারা আছে এবং থাকবে–অক্ষয় এবং অবিনশ্বর। এখন অবশ্য আমরা জানি শুরুতে তারারা ছিল না, তারারা অক্ষয়ও নয়। এদের আছে সৃষ্টি এবং লয়, এমনকি মৃত তারা থেকে নতুন তারা সৃষ্টির পরম্পরা। অনেকটা জীবজগতে ঘটে যাওয়া জীবনচক্রের মতো।

দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বয়স প্রায় চৌদ্দ বিলিয়ন বছরের কাছাকাছি। শুরু থেকে মহাবিশ্বের বিকাশ ও প্রসারণ কয়েকটি ধাপে সংঘটিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখাটিতে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, তা বিগ-ব্যাং কসমোলজি (Big-bang cosmology) নামে পরিচিত। বিগ-ব্যাং কসমোলজি আমাদের সামনে মহাবিশ্বের যে প্রতিরূপটি (model) ফুটিয়ে তোলে, তা অনুযায়ী অকল্পনীয় শক্তিঘনত্ব (energy density) থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি। উৎপত্তিক্ষণ থেকে মাত্র তিন মিনিটের মাথায় অত্যন্ত হালকা কিছু পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়া শুরু হয়। এই নিউক্লিয়াসগুলোর মধ্যে ছিল প্রধানত হাইড্রোজেন, ডিউটেরন (একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন নিয়ে গঠিত হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ), হিলিয়াম এবং কিছু লিথিয়াম। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এই তিন মৌলই মহাবিশ্বজুড়ে অনেকটা রাজত্ব করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ভারী মৌল তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে অনেক পরে। এদের সৃষ্টি মূলত তারার গর্ভে এবং কখনো কখনো সুপারনোভা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।

প্রাচীনতম গ্যালাক্সিগুলোর জন্ম বিগ-ব্যাংয়ের কয়েক শ মিলিয়ন বছর পরে। এসব গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রদের সৃষ্টি

প্রক্রিয়ার শুরুও মোটামুটি একই সময়ে। সেই সময় থেকে এখন অব্দি নতুন নতুন গ্যালাক্সি এবং তারা তৈরির ধারাবাহিকতা চলছে নিরন্তর। দৃশ্যমান মহাবিশ্বে $১০^{২৩}$ (একের পর ২৩টি শূন্য।) এর অধিক নক্ষত্র।

একটি নক্ষত্র জন্ম নেয় কীভাবে? মহাবিশ্বজুড়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ানো হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মতো হালকা মৌলগুলোর ভেতর মহাকর্ষীয় বল বিদ্যমান। মূলত ভর আছে, এমন সব বস্তুকণার মধ্যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল কাজ করে। এই আকর্ষণ বলের প্রভাবে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মতো অণুগুলো পরস্পর কাছে আসে। সৃষ্টি হয় গ্যাসপিণ্ডের। এই পিণ্ডে অবস্থিত গ্যাসকণার আরেক নাম তারকা ধূলি (stellar dust)। এই গ্যাসপিণ্ড আকারে এবং সামগ্রিক ভরে যতই বড় হতে থাকে, সৃষ্ট মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (gravitational field) ততই শক্তিশালী হয়। ফলে তা আরও দূরে অবস্থিত অণু-পরমাণুদের কাছে টেনে আনার ক্ষমতা লাভ করে। এতে গ্যাসপিণ্ড আকারে আরও বড় এবং ভারী হয়, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র হয় আরও শক্তিশালী। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় বিশাল সব গ্যাসপিণ্ড। বাংলায় এদের বলা যেতে পারে প্রাক্-নক্ষত্র। ইংরেজিতে বলা হয় প্রোটোস্টার (Protostar)। অপেক্ষাকৃত হালকা পিণ্ডগুলো থেকে সৃষ্টি হতে পারে গ্রহসমূহের। তবে গ্রহসমূহের গঠন উপাদান নক্ষত্র থেকে কিছু আলাদা। গ্রহগুলোতে ভারী মৌলের পরিমাণ অনেক বেশি। যাহোক, এই গ্যাসীয় প্রাক্-নক্ষত্রের মধ্যকার অণুগুলো নিজেরাও মাধ্যাকর্ষণজনিত আকর্ষণ বল অনুভব করতে থাকে এবং একে অপরের কাছে চলে আসে। ফলে ঘনত্ব বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় বিপুল তাপ। এই তাপশক্তির উৎস ক্রমহ্রাসমান মহাকর্ষীয় বিভব শক্তি (gravitational potential energy)। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অবস্থিত বস্তুকণা যখন পরস্পর কাছাকাছি আসে তখন মহাকর্ষীয় বিভব শক্তি কমতে থাকে। হারানো শক্তি পরিণত হয় তাপশক্তিতে। শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। এখানেও ঠিক তাই ঘটে। মহাকর্ষীয় বিভব শক্তির হ্রাসকৃত অংশটি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে সংকোচনশীল প্রাক্-নক্ষত্রের কেন্দ্রে গ্যাসের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার প্রাপ্তিক মান নির্ভর করে প্রাক্ নক্ষত্রের সমগ্র ভরের ওপর। তাপমাত্রা একটি পর্যায়ে পৌঁছালে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হয়। শুরু হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন (nuclear fusion)।

ফিউশন একটি নিউক্লিয়ার মিথস্ক্রিয়ার (nuclear interaction) নাম। ফিউশনের ফলে দুটি হালকা নিউক্লিয়াস জোড়া লেগে একটি ভারী নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। ফিউশন বিক্রিয়ায় বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়। সৌরজগতের অধিপতি সূর্য প্রায় ৫০০ কোটি বছর ধরে যে তাপ ও আলোক শক্তি বিতরণ করে চলেছে, তার পেছনে রয়েছে এই নিউক্লিয়ার ফিউশন। ফিউশনের সরলতম উদাহরণ হচ্ছে দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মিলে একটি ডিউটেরন নিউক্লিয়াস তৈরি এবং এই ডিউটেরন নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আবারও একটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস সৃষ্টি। দুটি হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস থেকে ফিউশনের ফলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় হিলিয়াম-৪, সেই সঙ্গে দুটি হাইড্রোজেন। এই পুরো প্রক্রিয়া থেকে শক্তি উৎপাদিত হয় ২৪ মেগা ইলেকট্রন-ভোল্টের মতো। যেসব নিউক্লিয়াস ফিউশনে অংশ নেয় এবং ফিউশন শেষে যা পাওয়া যায় তাদের ভেতর ভরের পার্থক্য রয়েছে। এই হারানো ভরটুকুই আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E=mc^2$ সূত্র অনুযায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে যে শক্তি পাই, তার উৎস হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া। একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা মোটামুটি কয়েক ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যায়ের। এক মেগা ইলেকট্রন-ভোল্ট হচ্ছে এক মিলিয়ন বা ১০ লাখ

ইলেকট্রন-ভোল্টের সমান। কাজেই যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার চেয়ে নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে লক্ষ বা কোটি গুণে বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়। ফিউশনের ফলে নক্ষত্রের কেন্দ্রে বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত তাপশক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তি ফিউশন বিক্রিয়ার হারকে করে ত্বরান্বিত এবং যতক্ষণ ফিউশন উপযোগী অপেক্ষাকৃত হালকা মৌলের নিউক্লিয়াসের সরবরাহ অব্যাহত থাকে, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস তৈরি এবং শক্তি উৎপাদনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। নক্ষত্র শক্তি উৎপাদন করতে থাকে। নিচে কয়েকটি ফিউশন বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো।

হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস + হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস→ডিউটেরন নিউক্লিয়াস + পজিট্রন[১] + নিউট্রিনো[২]

ফিউশনের ফলে উৎপন্ন ডিউটেরনটি আর একটি হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়-

ডিউটেরন নিউক্লিয়াস + হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস→হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস[৩] + গামা রশ্মি

এরপর হিলিয়াম-৩ অপর একটি হিলিয়াম-৩ এর সঙ্গে যুক্ত হয়-

হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস + হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস→হিলিয়াম-৪ নিউক্লিয়াস[৪] + হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস + হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস

এই ফিউশন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয় এবং প্রক্রিয়া শেষে শক্তি পাওয়া যায় ২৪.৭ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট।

আগেই বলা হয়েছে, নক্ষত্রের কেন্দ্র যথেষ্ট উত্তপ্ত না হলে ফিউশনের শুরু হয় না। যেমন হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ফিউশন চক্র শুরু করতে হলে একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রের তাপমাত্রা হতে হয় এক কোটি ডিগ্রি কেলভিনের কিছু বেশি। বেশির ভাগ ধাতব পদার্থ হাজার ডিগ্রি কেলভিনেই গলে যায়। কাজেই নক্ষত্রের কেন্দ্র কী ভীষণ উত্তপ্ত, এ থেকে নিশ্চয়ই তা বোঝা যাচ্ছে। এই প্রচণ্ড উত্তাপ ফিউশনের জন্য কেন প্রয়োজন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের ইলেকট্রিক চার্জের ভেতরে যে মিথস্ক্রিয়া, তা বিবেচনায় আনতে হবে। সবাই জানেন, সমধর্মী চার্জ পরস্পর বিকর্ষণ করে। ধরা যাক, দুটি সমধর্মী চার্জ আছে যাদের ভেতর বিকর্ষণ বল বিদ্যমান। এই বলকে কুলম্ব বল বলা হয়। এই বিকর্ষণ বল চার্জ দুটির মানের গুণফল এবং তাদের মধ্যকার দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। দূরত্ব যত কম, বিকর্ষণ বল তত তীব্র (পাঠ্যবইয়ের ভাষায় বলতে হয়, চার্জদ্বয়ের মধ্যকার কুলম্ব বল চার্জগুলোর মানের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের ভেতর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক)। ফিউশনের কথায় ফিরে আসি। হাইড্রোজেন নিয়েই একটু ভাবা যাক। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসে একটি করে প্রোটন আছে। প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক এবং মানের দিক থেকে ইলেকট্রনের চার্জের সমান। কাজেই দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ভেতর কুলম্ব বিকর্ষণ কাজ করে। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস দুটির মধ্যে দূরত্ব যতই কমবে, এই বিকর্ষণ বল ততই বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ বিকর্ষণী কুলম্ব বল কখনোই চাইবে না যে দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস পরস্পর কাছাকাছি আসুক। অথচ যথেষ্ট কাছাকাছি না এলে ফিউশন ঘটার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কুলম্ব বিকর্ষণকে উপেক্ষা করে কাছে আসতে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের প্রয়োজন উচ্চ গতিশক্তি। নক্ষত্রের কেন্দ্রে তৈরি হওয়া বিপুল তাপশক্তি থেকেই হালকা নিউক্লিয়াসগুলো এই গতিশক্তি লাভ করে এবং কুলম্ব-বাধা অতিক্রম করে ফিউশন বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। যেসব গ্যাসপিণ্ড অপেক্ষাকৃত হালকা তার কেন্দ্র যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না। ফিউশন শুরু হয় না এবং এরা

শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রে পরিণত হতে পারে না। নক্ষত্র তারাই কেবল যাদের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়ার ফিউশন চলছে এবং অবিরাম শক্তি উৎপাদন জারি আছে। গ্যাসপিণ্ড থেকে ফিউশন শুরুর আগ পর্যন্ত অবস্থাটিকে গর্ভস্থ ভ্রূণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ফিউশন শুরুর অর্থ হচ্ছে একটি শিশু তারার জন্ম।

একটি নক্ষত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ভর ও আয়তন। নক্ষত্রের আয়তন নির্ভর করে দুটি নিয়ামকের ওপর। ফিউশনের ফলে কেন্দ্রে সৃষ্ট শক্তি বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়। এর প্রবণতা হচ্ছে নক্ষত্রটিকে স্ফীত করে তোলা। অন্যদিকে সর্বদা আকর্ষণী মহাকর্ষ বল চায় নক্ষত্রটিকে সংকুচিত করতে। এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রের একটি সাম্য (equilibrium) আয়তন দাঁড় করায়। যেকোনো একটি প্রবণতা অপরটিকে ছাপিয়ে গেলে একটি নক্ষত্র হয় স্ফীত অথবা সংকুচিত হতে শুরু করে। যখন একটির প্রবণতা অন্যটির সমান হয় তখন নক্ষত্রের আয়তন স্থির থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় উদস্থিতিক সাম্যাবস্থা (hydrostatic equilibrium)। ভারী নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন ফিউশন চক্র। শুরুতে হাইড্রোজেন থেকে ডিউটেরন, এরপর হিলিয়াম ইত্যাদি। এই অবস্থায় নক্ষত্রের ভেতর তৈরি বহির্মুখী শক্তিপ্রবাহ অনেক সময় মাধ্যাকর্ষণজনিত বিভব শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। নক্ষত্র তখন আকারে বড় হতে থাকে। নক্ষত্রের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন থেকে ফিউশনের মাধ্যমে হিলিয়াম তৈরির হার একপর্যায়ে কমে আসে (যেহেতু কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের মজুত অসীম নয়)। কেন্দ্রে জমা হতে থাকে আপার নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। তবে একই সঙ্গে ফিউশনসৃষ্ট তাপের ফলে কেন্দ্রের কাছে চারদিকে অবস্থিত হাইড্রোজেন স্তরে নতুন করে ফিউশন শুরু হতে পারে। এই অবস্থায় শক্তি উৎপাদনের হার আবার বৃদ্ধি পায় এবং নক্ষত্রটি দ্রুত স্ফীত হতে শুরু করে। একটি নক্ষত্রের ঘনত্ব সবখানে একই রকম নয়। কেন্দ্রের চারপাশে ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব কমতে থাকে। নক্ষত্রের স্ফীতি মূলত অপেক্ষাকৃত হালকা এই বাইরের স্তরেই। একটি স্ফীত নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ শত থেকে হাজার গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে, আয়তন বেড়ে দাঁড়াতে পারে মিলিয়ন গুণ। এই ধরনের স্ফীত নক্ষত্রকে লাল দানব (Red giant) বলা হয়ে থাকে।

আমরা জেনেছি, সূর্যের বয়স প্রায় পাঁচ বিলিয়ন বছর। সৃষ্টির পর থেকেই সূর্যের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন ফিউশন চলছে। এই ফিউশন চলবে আরও পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে। এর শেষ দিকে সূর্য পরিণত হবে এক লাল দানবে। বর্তমানে সূর্যের যে আকার, লাল দানব দশায় আকার (আয়তন) গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় মিলিয়ন গুণে বড় (চিত্র-১)। সূর্য স্ফীত হতে শুরু করলে সৌরজগতের সব গ্রহ প্রবলভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। সাগর শুকিয়ে যাবে। ধারণা করা হয়, একপর্যায়ে সূর্য এতটাই স্ফীত হয়ে যাবে যে পৃথিবী ঢুকে যাবে সূর্যের অভ্যন্তরে। পৃথিবী নামক আমাদের এই অতি প্রিয় গ্রহটির এই দুর্গতির কথা ভাবলে খারাপ লাগতে পারে। তবে স্বস্তির কথা হচ্ছে, এমন ঘটনা ঘটতে এখনো শত শত কোটি বছর দেরি আছে। লাল দানব দশা সূর্যের বা তুলনীয় ভরবিশিষ্ট নক্ষত্রগুলোর শেষ পরিণতি নয়। তবে অন্তিম সময়ের শুরু। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন এখন থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর পর, সূর্য পরিপূর্ণ লাল দানবে পরিণত হওয়ার পরে ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করতে পারবে আর মাত্র ১০ কোটি বছর পর্যন্ত। নক্ষত্রের জীবনের এই শেষ ১০ কোটি বছর অত্যন্ত ঘটনাবহুল এবং তার খুঁটিনাটি বর্ণনা বুঝতে হলে জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকতে হবে। এই লেখাটি যেহেতু সব শ্রেণির পাঠকদের কথা বিবেচনা করে রচিত, খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বাদ দিয়ে অনেকটা মোটা দাগে লাল দানব-পরবর্তী সময়টুকুর একটি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আশ্রয় আমরা নিতে যাচ্ছি।

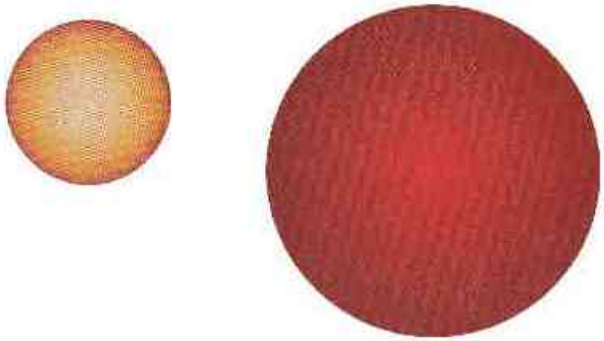

চিত্র-১ বাঁয়ে আজকের সূর্য। ডানে সূর্য–লাল দানব দশায়। একটি তুলনামূলক চিত্র।

লাল দানব দশায় নক্ষত্রের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের চেয়ে উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট হিলিয়াম নিউক্লিয়াস জমা হয়। উচ্চ ঘনত্ব শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং নক্ষত্রের কেন্দ্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একপর্যায়ে তাপমাত্রা ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। এই তাপমাত্রা হিলিয়াম ফিউশন চক্র শুরুর জন্য উপযোগী। এর ফলে শুরু হয় বিপুল হারে কেন্দ্রীয় হিলিয়াম ফিউশন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন। হিলিয়াম ফিউশন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় কার্বন ও অক্সিজেনের মতো ভারী নিউক্লিয়াসের। কার্বন তৈরির প্রক্রিয়াটি ট্রিপল-আলফা প্রক্রিয়া নামে পরিচিত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহাবিশ্বে প্রাণের যে অস্তিত্ব, তা আমাদের জানামতে পুরোপুরি কার্বননির্ভর। কার্বন নিউক্লিয়াসের একটি বিশেষ উত্তেজিত শক্তিস্তরের উপস্থিতি নক্ষত্রের গর্ভে কার্বন তৈরিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখে। কেতাবি ভাষায় ঘটনাটিকে আমরা কার্বন রেজোন্যান্স (অনুনাদ) বলে থাকি। পদার্থবিদ ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) এই অনুনাদের ধারণা উপস্থাপন করেন বলে একে হয়েল রেজোন্যান্সও বলা হয়ে থাকে। এই বিশেষ শক্তিস্তরটি না থাকলে মহাবিশ্বে কার্বনের পরিমাণ হতো অনেক কম এবং কার্বন-নির্ভর প্রাণের অস্তিত্বই হয়তো অসম্ভব হয়ে উঠত। কার্বন নিউক্লিয়াসের সঙ্গে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ফিউশনের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারে, এর ফলে তৈরি হয় অক্সিজেন। অক্সিজেনও প্রাণের জন্য এক অপরিহার্য মৌল। এছাড়া কার্বন ও হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস। ট্রিপল-আলফা থেকে কার্বন এবং ক্রমান্বয়ে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সৃষ্টির ফিউশন প্রক্রিয়াকে একত্রে কার্বন সাইকেল বা চক্র বলা হয়ে থাকে।

সূর্য বা তার কাছাকাছি ভরসম্পন্ন নক্ষত্রের জন্য এই কার্বন সাইকেলই হচ্ছে শেষ ফিউশন চক্র। সূর্যের চেয়ে অনেক কম ভরবিশিষ্ট তারকারাজির জন্য হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরির প্রক্রিয়াই শেষ কথা। যেসব নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে অনেক গুণে ভারী সেখানে কার্বন সাইকেলের পরবর্তী সাইকেলগুলো চলতে থাকে। এর ফলে তৈরি হয় অক্সিজেনের চেয়ে ভারী মৌলসমূহ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, নক্ষত্রের ভর যত কম তার জীবনকাল তত দীর্ঘ। আসলে অধিক ভর তীব্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি করে এবং নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এর ফলে ফিউশন ত্বরান্বিত হয়। সব মিলিয়ে নক্ষত্রের ভেতর ফিউশনযোগ্য নিউক্লিয়াসগুলো খুব দ্রুত নিজ নিজ সাইকেল বা চক্র সমাপ্ত করে।

লাল দানবে পরিণত হওয়ার পর, একপর্যায়ে নক্ষত্র তার বাইরের অংশটুকু চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে, এর কারণ হচ্ছে ফিউশন সৃষ্ট বহির্মুখী চাপ এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত অন্তর্মুখী চাপের

টানাপোড়েন। এর ফলে নক্ষত্রের বাইরের স্তর কিছুটা 'আলগা' হয়ে যায় এবং ফিউশন শক্তি যখন মাধ্যাকর্ষণজনিত বিভব শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন এই 'আলগা' অংশটি নক্ষত্রের চারপাশের মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। নক্ষত্রের ভেতরের দিকের উচ্চ ঘনত্ব এবং তাপমাত্রাবিশিষ্ট অংশ অটুট থাকে। একে আমরা নক্ষত্রের অবশিষ্টাংশ বলে অভিহিত করব। নক্ষত্রের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া বস্তুসমূহকে (হাইড্রোজেন, হিলিয়ামের মতো হালকা মৌল এবং কিছু অন্যান্য আয়নিত গ্যাস) প্ল্যানেটারি নেবুলা (Planetary nebula) বলা হয় (চিত্র-২)। এই অবস্থায় নক্ষত্রের ভেতরের অংশে নতুন করে ফিউশন চক্রে অংশ নেওয়ার মতো আর কোনো নিউক্লিয়াস অবশিষ্ট থাকে না। শক্তির উৎস নিঃশেষ হওয়ায় মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে চাপ সৃষ্টি করা প্রথম দিকে সম্ভব হয় না। ফলে নক্ষত্রের এই অবশিষ্টাংশ মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সংকুচিত হতে থাকে। সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় ভরের নক্ষত্রগুলোর ক্ষেত্রে এই সংকোচন একটি পর্যায়ে এসে থেমে যায়। এর কারণ হচ্ছে ইলেকট্রনের একটি বিশেষ ধর্মের কারণে সৃষ্ট বহির্মুখী চাপ। আমরা বলি electronic degeneracy pressure, বাংলায় ইলেকট্রনিক আপজাত্য চাপ। বিষয়টি বুঝতে হলে মৌলিক কণাগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু জানতে হবে। মৌলিক কণাগুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে–ফার্মিয়ন (Fermion) ও বোসন (Boson) (বাঙালি পদার্থবিদ সত্যেন বোসের নামানুসারে)। একটি সিস্টেমে দুটি ফার্মিয়ন কখনো একই অবস্থায় (কঠিন করে বললে, একই কোয়ান্টাম স্টেটে) থাকতে পারে না। এটাই বিজ্ঞানী পাউলির বর্জন নীতি (Pauli's exclusion principle)। অন্যদিকে যারা বোসন তারা মিশুক প্রকৃতির, একই অবস্থায় অনেকের থাকতে কোনো আপত্তি নেই। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন হচ্ছে ফার্মিয়নের উদাহরণ। আলোক কণিকা, ফোটন, বোসনের একটি উদাহরণ। নক্ষত্রের অবশিষ্টাংশে যে ইলেকট্রনগুলো আছে তারা সংকোচনের ফলে কাছাকাছি চলে আসে। একসময় সংকোচন এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে বর্জন নীতি মেনে চলা এই ইলেকট্রনগুলোর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় ইলেকট্রনগুলো তাদের ফার্মিয়নিক প্রকৃতি বজায় রাখতে গিয়েই মাধ্যাকর্ষণজনিত সংকোচন প্রবণতার বিপরীতে একটি চাপ সৃষ্টি করে। এই দুইয়ে মিলিয়ে একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নক্ষত্রের অবশিষ্টাংশ একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। এই নির্দিষ্ট আকারের উত্তপ্ত এবং সংকুচিত বস্তুপিণ্ডকে শ্বেত বামন (White dwarf) বলা হয়ে থাকে। শ্বেত বামন সূর্যের মতো তারাদের শেষ পরিণতি। আসলে এদের তারার অবশিষ্টাংশ বলাই শ্রেয়, কারণ এরা তারা নয়। তারা হতে হলে একটি অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস থাকতে হয়। শ্বেত বামনের তা নেই।

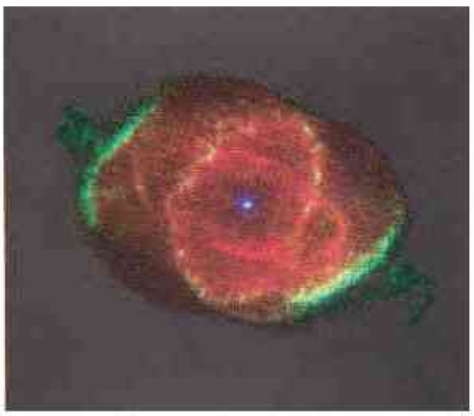

চিত্র-২ প্ল্যানেটারি নেবুলা। নক্ষত্রের উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় অংশটি নেবুলার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান।

বাইরের স্তর মহাশূন্যে ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যের অবশিষ্টাংশ যখন শ্বেত বামনে পরিণত হবে তখন তার ভর দাঁড়াবে আজকের ভরের মোটামুটি ৬০ শতাংশ। সংকুচিত এই শ্বেত বামনের আকার হবে পৃথিবীর কাছাকাছি। এই মুহূর্তে সূর্যের ভর পৃথিবীর ৩,৩০,০০০ গুণ। আয়তন পৃথিবীর ১৩,০০,০০০ গুণ। অর্থাৎ শ্বেত বামন দশায় সূর্যের অবশিষ্টাংশের ভর হবে পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দুই লাখ গুণে বেশি কিন্তু আয়তন পৃথিবীর সমান। শ্বেত বামনের বস্তু ঘনত্ব সম্পর্কে এখান থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে। আমরা সবাই এক লিটারের বোতল দেখেছি। এই বোতল যদি শ্বেত বামনের উপাদান দিয়ে ভর্তি করা হয় তবে তার ভর গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় দৃশ্যে পূর্ণ বয়স্ক আফ্রিকান হাতির সমান। রাতের আকাশে শ্বেত বামন একটি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর মতো দেখায়। মহাকাশের গড় তাপমাত্রা অত্যন্ত কম। তাপগতিবিদ্যার রীতি অনুযায়ী উত্তপ্ত বস্তু শীতল পরিবেশে তাপশক্তি হারাতে থাকে। এই নিয়ম অনুসারে শ্বেত বামন মহাকাশে তাপশক্তি বিকিরণের মাধ্যমে একটু একটু করে শীতল হতে থাকে। শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উজ্জ্বলতাও কমতে থাকে। এই প্রক্রিয়া অবশ্য অত্যন্ত ধীর। একটি শ্বেত বামনের শীতলীকরণ প্রক্রিয়া শেষ হতে হাজার কোটি বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে। শীতলীকরণ শেষে শুরুতে উজ্জ্বল শ্বেত বামন তার উজ্জ্বলতা হারায়। তখন আর তা দৃশ্যমান থাকে না। এই অবস্থায় একে কৃষ্ণ বামন বলাটাই সংগত। আমাদের সবচেয়ে কাছের শ্বেত বামনটি হচ্ছে সিরিয়াস-বি (Sirius-B), দূরত্ব প্রায় ৮.৬ আলোকবর্ষ[৬৮]।

সূর্যের চেয়ে দশ গুণ বা তার চেয়েও বেশি ভরবিশিষ্ট নক্ষত্রগুলো ফিউশন শেষে শ্বেত বামনে পরিণত হয় না। এরা নিউট্রন তারায় (Neutron star) রূপান্তরিত হয়। নিউট্রন তারা নামে তারা হলেও প্রকৃত পক্ষে তারা নয়, কারণ শ্বেত বামনের মতোই এর ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের কোনো ক্ষমতা নেই। নিউট্রন তারার কথা বলতে গেলে যে চমকপ্রদ প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে তা হচ্ছে সুপারনোভা বিস্ফোরণ। ভারী নক্ষত্রের জীবনচক্রে সুপারনোভা বিস্ফোরণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা আগেই জেনেছি, ফিউশন চক্র শেষে নক্ষত্রের কেন্দ্রে উচ্চ ঘনত্বের ভারী মৌল পুঞ্জীভূত হতে থাকে। নক্ষত্রের ভর যত বেশি কেন্দ্রীয় ঘনত্বও তত বেশি। আবার এটাও আমাদের জানা যে নক্ষত্রের বাইরের স্তর অনেক হালকা এবং অনেকটাই আলগা। অতি উচ্চ ঘনত্বের কেন্দ্রীয় অংশ প্রবল শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ বলের সৃষ্টি করে। যেহেতু ফিউশন চক্র সমাপ্ত, কাজেই বহির্মুখী চাপ আর কার্যকরী থাকে না। এই অবস্থায় নক্ষত্রের বাইরের হালকা স্তর প্রবল বেগে সংকুচিত হতে চায় এবং কেন্দ্রের দিকে ধেয়ে আসে। এই ধেয়ে আসা বস্তু উচ্চ ঘনত্বের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারে না। এদের পরিণতি হয় অত্যন্ত দৃঢ় একটি দেয়ালের দিকে তীব্র গতিতে ধাবমান যে বস্তু আছড়ে পড়ে উল্টো দিকে ছিটকে যায় তার মতো। এ এক মহাযজ্ঞ। সুপারনোভা বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের বাইরের আলগা অংশটি দ্রুতবেগে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সুপারনোভা বিস্ফোরণে বিপুল পরিমাণ শক্তি মহাশূন্যে ছড়িয়ে যায়। অল্প সময়ের জন্য একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণে বিপুল পরিমাণ শক্তি মহাশূন্যে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এই অল্প সময়ের জন্য একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের ঔজ্জ্বল্য একটি গ্যালাক্সির সব তারার ঔজ্জ্বল্যকে হার মানাতে পারে। সুপারনোভা বিস্ফোরণের আরও একটি উপায় আছে। কোনো কারণে যদি নক্ষত্রের অভ্যন্তরে হঠাৎ একটি শক্তিশালী ফিউশন চক্র শুরু হয়, তাহলেও এমনটি ঘটতে পারে।

ফিউশনের মাধ্যমে ভারী মৌলের সৃষ্টি অবিরত চলতে পারে না। এর একটি সীমা আছে। এই সীমা নির্ধারণ

করে নিউক্লীয় বন্ধন শক্তি (nuclear binding energy)। এই নিউক্লীয় বন্ধন শক্তি ফিউশনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় নিকেলের (Ni) চেয়ে ভারী কোনো মৌল তারার ভেতরে সৃষ্টি হতে দেয় না। তেজস্ক্রিয় নিকেল সৃষ্টির পরপরই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লোহায় (Fe) পরিণত হয়। অর্থাৎ লোহাই তারার গর্ভে সৃষ্ট সবচেয়ে ভারী মৌল। তাহলে প্রশ্ন জাগে, লোহার চেয়ে ভারী মৌলগুলো এলো কোথা থেকে? সুপারনোভা বিস্ফোরণ, এই প্রশ্নের একটি উত্তর। সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়, সেখান থেকে লোহার চেয়ে ভারী মৌল তৈরি হতে পারে। সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে একটি নক্ষত্র তার অনেকখানি ভর মহাকাশে ছড়িয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় যে অংশটুকু রয়ে যায়, তা হচ্ছে একটি নিউট্রন স্টার।

নিউট্রন তারার কথা আবার শুরুর আগে শ্বেত বামনের প্রসঙ্গে একটু আসা যাক। শ্বেত বামন তার গঠনগত স্থিতি ধরে রাখে অন্তর্মুখী মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপ এবং বহির্মুখী ইলেকট্রনিক আপজাত্য চাপের সমতার কল্যাণে। নিউট্রন তারাগুলোর ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটে। তবে ইলেকট্রনিক আপজাত্য চাপের পরিবর্তে এখানে বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি হয় নিউট্রন আপজাত্য দশা থেকে। ইলেকট্রনের মতো নিউট্রনও একধরনের ফার্মিয়ন। কাজেই বিশেষ পরিস্থিতিতে নিউট্রন আপজাত্য চাপের উদ্ভব ঘটতে পারে এবং তীব্র মহাকর্ষীয় সংকোচন প্রবণতা প্রশমিত করে একটি গঠনগত স্থিতির উদ্ভব হতে পারে। নিউট্রন তারার অকল্পনীয় বস্তু ঘনত্ব এই বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শ্বেত বামনের বিপুল বস্তু ঘনত্বের কথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু নিউট্রন তারার বস্তু ঘনত্বের তুলনায় তা যেন কিছুই নয়। একটি ক্রিকেট বলের কথা বিবেচনা করি। নিউট্রন তারার উপাদান দিয়ে তৈরি একটি ক্রিকেট বলের ওজন এই মুহূর্তে পৃথিবীতে বসবাসকারী সব (৭০০ কোটির মতো) মানুষের ওজনের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি।

একটি প্রসঙ্গ বোধ হয় এখানে আলোচনার দাবি রাখে। আমরা জানি, মৌলের কেন্দ্রে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস, আর কেন্দ্রের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে ইলেকট্রন। প্রচণ্ড তাপের কারণে নক্ষত্রের ভেতরে ইলেকট্রনগুলো অবশ্য আর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আটকানো থাকে না। তারা প্রবল গতিশক্তি নিয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। নিউট্রন তারা শুধুই নিউট্রন দিয়ে তৈরি। ফিউশনের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রীয় মৌলগুলোর প্রোটন আর ছোটাছুটি করতে থাকা ইলেকট্রনের কী হলো? বিষয়টি বুঝতে হলে নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রন ক্যাপচার (electron capture) নামক একটি প্রক্রিয়ার কথা জানতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রন মিলে একটি নিউট্রন তৈরি হয়। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয় অত্যন্ত হালকা ভরবিশিষ্ট এক মৌলিক কণিকা নিউট্রিনো। এভাবেই নিউট্রন তারায় প্রোটন ও ইলেকট্রন বিলীন হয়ে বাড়তি নিউট্রন তৈরি হয়।

নক্ষত্রের ভর যদি আরও বেশি হয়? অর্থাৎ নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অংশের ভর এবং ঘনত্ব যদি এত বেশি হয় যে নিউট্রন আপজাত্য চাপ মহাকর্ষীয় সংকোচনকে প্রশমিত করতে না পারে, তখন কী হবে? এই অবস্থায় মহাকর্ষীয় সংকোচন জয়ী হবে এবং নক্ষত্রটি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হতে হতে সৃষ্টি হবে একটি ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণবিবরের। কৃষ্ণবিবর হচ্ছে প্রায় অসীম ঘনত্বের বস্তুপিণ্ড, যা বিশাল একটি তারকার জীবনের অন্তিম দশা। কৃষ্ণবিবর আসলেই কৃষ্ণ, তার কারণ এখান থেকে আলোও বেরিয়ে যেতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞানে মুক্তিবেগ বলে একটা কথা আছে। ইংরেজিতে বলে escape velocity। এই মুক্তিবেগে কোনো বস্তুকে ওপর দিকে ছুড়ে দিলে তা আর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিচে ফিরে আসে না। মুক্তিবেগ নির্ভর করে বস্তুর ঘনত্ব এবং আকারের ওপর। পৃথিবীর জন্য মুক্তিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ১১ কিলোমিটারের একটু বেশি। এই বেগে

ভূপৃষ্ঠ থেকে কোনো ভর ওপরে ছুড়ে দিলে তা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। কৃষ্ণবিবরের জন্য মুক্তি-বেগ আলোর বেগের সমান বা তার চেয়েও বেশি। আবার আমাদের এটাও জানা আছে, কোনো বস্তুকণাই আলোর বেগ অতিক্রম করতে পারে না। অর্থাৎ কৃষ্ণবিবরের ভেতর থেকে কোন বস্তুকণা তো দূরে থাক, আলোরও বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কৃষ্ণবিবরের ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। আমাদের পৃথিবী যদি সেই ঘনত্ব অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকে মোটামুটি এক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি গোলকের ভেতর আবদ্ধ করে ফেলতে হবে। ব্যাপারটি দাঁড়াবে অনেকটা এই রকম–বড় সাইজের একটি মার্বেল, যার ভর সমগ্র পৃথিবীর সমান।

কৃষ্ণবিবর, নিউট্রন তারা, শ্বেত বামন বা লাল দানব, এর প্রতিটিই এক একটি বিশাল আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। ক্ষুদ্র পরিসরে খুব সামান্যই বর্ণনার সুযোগ আছে। এখানে যেটুকু বর্ণনা করা হয়েছে, তা ক্ষেত্রবিশেষে অতিসরলীকৃত। পাঠকের মনে সামান্য কৌতূহল জাগানোই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

সমাপ্তি টানার আগে একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। শুরুতে নক্ষত্রের জীবনের কথা বলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ভরের নক্ষত্রের অন্তিম দশারই একটি বর্ণনা দিয়েছি। আসলে এই বর্ণনার মাঝেই নক্ষত্রের জন্মের কথাটিও পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। প্ল্যানেটারি নেবুলা এবং সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের বাইরের যে অংশ মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, তা একপর্যায়ে আবার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে একত্র হয়ে সৃষ্টি করে গ্রহ, প্রাক্-নক্ষত্র এবং শিশু নক্ষত্র। এভাবেই নক্ষত্ররা তাদের জন্ম, বিকাশ আর মৃত্যুর ধারাবাহিকতা হাজার কোটি বছর ধরে চালু রেখেছে।

[১]পজিট্রন–ইলেকট্রনের প্রতিকণা (antiparticle)। এদের ভর ইলেকট্রনের সমান, তবে তড়িৎ আধান ইলেকট্রনের বিপরীত, অর্থাৎ ধনাত্মক।

[২]নিউট্রিনো–প্রায় ভরহীন এবং আধানহীন একটি মৌলিক কণিকা।

[৩]হিলিয়াম–৩ হিলিয়ামের একটি আইসোটোপ। এর নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন রয়েছে।

[৪]হিলিয়াম–৪ হিলিয়ামের একটি আইসোটোপ। নিউক্লিয়াসে রয়েছে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। একে একত্রে আলফা কণাও বলা হয়।

[৫]আলোকবর্ষ হচ্ছে দূরত্বের একটি পরিমাপ। আলো শূন্য মাধ্যমে এক সৌর বছরে যে পথ অতিক্রম করে, তাকে আলোকবর্ষ বলা হয়। প্রতি সেকেন্ডে আলো শূন্য মাধ্যমে তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

প্রবন্ধকার : অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Illegal Hilsha Extraction: Technology Is the Solution

Muhammad Munir Chowdhury

Bangladesh yields highest Hilsha supply around the world. Rather, the most tasteful Hilsha is only available in Bangladesh for which the nation feels proud of it. It is not globally available fish. So millions of our gratitude to Almighty Allah for bestowing upon us such a blessing. But human disturbance and human greed are detrimental for Hilsha growth in our country. This valuable marine treasure which has immense role in our economy has fallen victim to our unabated greed. Every year government comes up with economic measures and enforcement drives during 22 days (October 9 – October 30) ban on Hilsha catching, storing and selling for ensuring safe spawning and proper breeding of mother Hilsha to boost Hilsha harvest in the country. Mobile courts have been playing a leading role to address the challenge. In most cases, the activities of the fishermen by flouting govt. ban are unintentional as their livelihood is a crucial issue. Here, economic needs turn into crime. But hoarders and large scale traders illegally extract Hilsha by using the poor fishermen for reaping unethical profit, which is catastrophic. Against such back drop, drives against the illegal catchers retard the goal of preventing the crime as the traditional human-driven enforcement seems to be troublesome in absence of modern technology. Mobile courts with the help of Coast Guard and Police have to spend huge time, energy, fuel and other operational costs to combat illegal catchers. But if we go for economic calculation, it seems to be costlier and also burdensome because of existence of our large marine territory (7000 sq km of 7 coastal districts) and also lack of sufficient human resources and logistics. So, we can't remain stuck in the same method of operation every year without having appropriate technology. I had spent nearly half decade on turbulent rivers and sea with tons of rushing water. The voyage seems to me really risky and hasty. No one actually knows how many trawlers and boats are moving for fishing. Actually, no inventory can be done without technology. Another most daunting task is to prevent the incoming foreign trawlers which also pose serious threat for our marine resource.

We have remarkable achievements of using science and technology in different

aspects of our life. For example, satellite tracking services of cyclone and its landfall have facilitated disaster response by mobilising communities. Besides

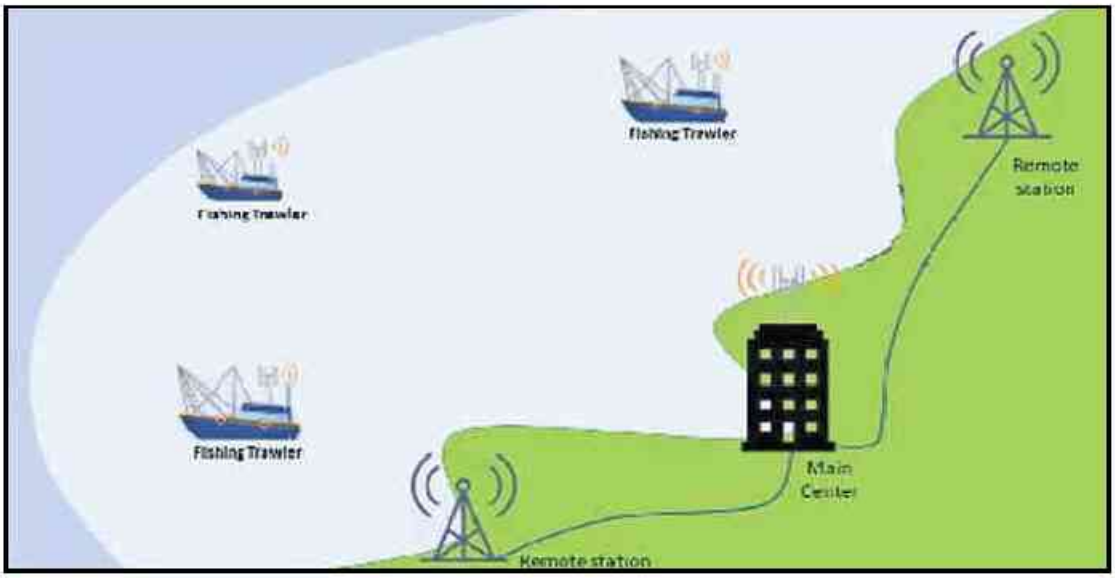

Figure: Technology for Tracking Illegal Fishing

IP cameras are effective instrument to detect the criminals even the vehicles or motorbikes used for criminal activities. In addition, IR (infra-red) cameras are also used at night to combat such crimes. Our latest achievement is in the health sector where technology has been proved effective in case of utilising community vision center. Equipments are set up to check the eye-patients from distant places. Patients are getting services from remote areas by dint of modern technology. Since we live in an era of digital monitoring and surveillance, so use of technology is absolutely pertinent. Definitely it will have positive impact on overall governance of fishing sector. Solution lies here by using tracking device that can meet the challenges of illegal Hilsha extraction desperately. A scientific innovation under the Automatic Identification System (AIS) can prevent such illegal fishing which is an automatic tracking system based on GPS.

This technology can trace movement of the vessel with its location and speed on the screen. AIS is basically for tracking and monitoring the whereabouts and activities of vessels. This technology functions within a range of certain

distance or boundary (For example less than 100 km) depending on location of coast-based Base Stations. Every government registered fishing trawler or vessel must carry the device (AIS- transponder) which will transmit the identification, position, course and speed at a specific time interval. Here, the AIS receiver at the coast will collect the data and send it to the main station for further processing. Even any vessel turns off the system, the controlling agency at the main station can easily identify the latest position of the vessel at the main station. If the marine territory is within a stretch of more than 100 km or more, then use of satellite is an essence to make it operative and effective. Besides, if access to SAR (Synthetic Aperture Radar) is available, then even in the night or in stormy or adverse weather, movement of vessels can be easily tracked by analysing the data. Thailand, Philippine and Malaysia have already applied such technology. But above everything, the success of such technology relies on commitment and capability of the law enforces. In addition, strong community involvement and support are also crucial for its success. So, we may go for screening its viability and cost-benefit analysis to prove its cost-effectiveness. A big push is needed, because time has come to control such corruption and also changing our habit of overfishing and overconsumption to habit of conservation. It appears that huge quantity of Hilsha is being stored by some elite and rich families in their refrigerators who forget the nutritional demand of lower income people. For the rich people, such over consumption is not their actual necessity or for subsistence, it absolutely originates from their unabated greed, which has led this resource to extinction.

So, this is prerequisite for adopting policy by the authorities (Ministry of Live Stock and Fisheries, Department of Shipping, Mercantile Marine Department) to enforce use of such technology for sustainable management of marine resources. To conclude the imposition of ban would be truly meaningful and the enforcement drives would be really effective, if technology is incorporated in the process. The fishermen, the citizens and the administration have to toil together with inclusive approach for protecting Hilsha resources; otherwise Hilsha will face potential threat like climate victims.

The writer is the Director General of
National Museum of Science and Technology.

ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ও নামকরণ

জহুরুল হক বুলবুল

তাবত দুনিয়ার সব জিনিস তন্নতন্ন করে খুঁজলে পাওয়া যায় মাত্র দুটো জিনিস। তার একটি পদার্থ আর একটি শক্তি। আমরা যারই অস্তিত্ব টের পাই–হয় সে পদার্থ না হলে শক্তি। পদার্থ কী, তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু শক্তি বা এনার্জি কী?

আজকাল অনেক ইংরেজি শব্দ বিশেষ করে বিজ্ঞানে, বাংলায় চালু হয়ে গেছে। তাই এনার্জি কথাটাও বাংলায় গ্রহণ করে নিলে দোষের হবে না। এনার্জি কথাটা দিয়ে অনেক কিছু বোঝা এবং বোঝানো যায় সহজে।

এনার্জি জিনিসটা কী, তা আমরা কমবেশি সবাই বুঝলেও, কিন্তু দু-এক কথায় সেটা ভালো করে বোঝানো মুশকিল। একটা মুশকিল হলো এই যে- এনার্জি জিনিসটাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। এর কোনো চেহারা নেই, তাই এনার্জির কোনো ছবি আঁকা যায় না। তাই এনার্জি কী, তা সোজা করে বলা কঠিন। তবু এনার্জি বলে একটা কিছু আছে তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। তা ছাড়া, আমরা এনার্জি তৈরি করতে পারি না এবং বিজ্ঞানের হিসেবমতো এনার্জি ধ্বংসও করতে পারি না। আমরা যা করতে পারি এনার্জি এক রূপ হতে অন্য রূপে পরিবর্তন করতে পারি। আর পারি এনার্জিকে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ এনার্জিকে আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারি।

বলপ্রয়োগ করে কোনো জিনিসকে সরিয়ে দিলে কাজ করা হয়। আর এ কাজের ফলে তাতে এনার্জি জমা হয়। অর্থাৎ কাজের মাধ্যমেই এনার্জির প্রকাশ। আবার কাজটি যে করে সে সমান পরিমাণ এনার্জি হারায়। তাহলে বলা চলে–এনার্জি হলো এমন কিছু, যা দিয়ে কাজ করা যায়।

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের এনার্জি প্রয়োজন। বিজ্ঞানের কাঁচামাল হলো এ এনার্জি। আমাদের প্রতিটি কাজে এনার্জি দরকার। এই যে আমি লিখছি, পড়ছি এর জন্যও এনার্জি দরকার। আমরা যখন হাঁটি তখন এনার্জি ব্যবহার করি, যখন দৌড়াই তখন আরও বেশি এনার্জি ব্যবহার করি। ছোটাছুটি বা খেলার সময় যথেষ্ট এনার্জির দরকার হয়। লেখাপড়া করতে গেলেও এনার্জি দরকার, খেতে বসলেও এনার্জি দরকার–এমনকি আমরা যখন ঘুমাই তখনো এনার্জি প্রয়োজন হয়।

নানা ধরনের কাজের জন্য আমরা বিভিন্ন রকম এনার্জি ব্যবহার করি। যেমন দেখার জন্য এনার্জি হিসেবে আলো লাগে, শোনার জন্য শব্দ এনার্জি। বৈদ্যুতিক এনার্জি দিয়ে আমরা যন্ত্রপাতি চালাই আবার রাসায়নিক এনার্জি ব্যবহার করে তড়িৎ কোষে বিদ্যুৎ তৈরি করি। আবার পানি গরম করার জন্য তাপ এনার্জির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ আমাদের সভ্যতার ইতিহাসটিই হচ্ছে এনার্জি তৈরি করে (এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করে) সেই এনার্জি ব্যবহারের ইতিহাস।

এই যে তাপ এনার্জির কথা বলা হলো–পরিমাণের দিক থেকে বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি এনার্জি রূপান্তর হয় তাপ এনার্জি থেকে। যাবতীয় যন্ত্রের যাবতীয় ইঞ্জিনে তাপ এনার্জিকে যান্ত্রিক এনার্জিতে রূপান্তর করা হয়।

রোদে কিছুক্ষণ বসলেই আমরা টের পেয়ে যাই রোদের যথেষ্ট তেজ আছে। রোদ হলো সূর্যের আলো। আর এই আলোর যে তেজ আমরা টের পাই তা হলো তাপ। বাতাস যখন জোরে বইতে থাকে তখন ঝড় ওঠে। ঝড়ের গতিবেগে প্রচুর এনার্জি আছে, তা আমরা সহজেই টের পাই। এ-ও সূর্যের এনার্জিরই অন্য রূপ। সূর্যের আলোর তাপে বাতাস গরম হয়ে ওঠে। বাতাস গরম হলেই হালকা হয়ে যায়। হালকা বাতাসের চাপও যায় কম হয়ে। এই গরম (উত্তপ্ত) বাতাস ঠান্ডা বাতাসের চাইতে হালকা, এই কারণে গরম বাতাস ক্রমশ ওপরের দিকে উঠতে শুরু করবে। গরম হালকা বাতাস ওপরের দিকে ওঠার সময় আশপাশের বাতাসকেও গরম ও হালকা করে দেবে। তার মানে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এবং ওখানে প্রায় বায়ুশূন্য হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। তখন চারদিক থেকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাতাস ওই শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্য ধেয়ে আসে। এই ধেয়ে আসা বাতাসকেই আমরা বলি ঝড়। তার মানে সূর্যের তাপ-এনার্জি বাতাসের গতি-এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই যে ঝড়ের কথা বলা হলো—এ ঝড়ের আরেক রূপ হলো সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের নাম এসেছে ঝড়ের ঘূর্ণন গতি থেকে। ঘূর্ণিঝড়ের ইংরেজি সাইক্লোন (cyclone) শব্দটা এসেছে এভাবে—ইংরেজ সাহেব প্রাক্তন জাহাজি হেনরি পিডিংটন কলকাতায় চাকরি করার সময় এ অঞ্চলের ঝড়ের দানবাকৃতি দেখে গ্রিক শব্দ kykols থেকে সাইক্লোন (cyclone) নাম প্রস্তাব করেন। যার একটা অর্থ সাপের কুন্ডলী (coil of snakes)। ১৮৪৮ সালে নাবিকদের জন্য তাঁর লেখা 'সেইলাস হর্ন বুক ফর দ্য ল অব স্টর্মস'-এ যার উল্লেখ দেখা যায়। স্যাটেলাইট থেকে সাইক্লোনের ছবিকে দেখা যায়, প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন বাতাস কুন্ডলীর আকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। অর্থাৎ নিম্নচাপজনিত কারণে যখন প্রচণ্ড গতিবেগে ঘূর্ণনের আকারে বাতাস বয়—তাকেই সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় বলে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা কমপক্ষে ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকা আবশ্যক এবং একটি নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকতে হয়। একই সঙ্গে বায়ুমন্ডলের নিম্ন ও মধ্যস্তরের অধিক আর্দ্রতাও ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আটলান্টিক মহাসাগরীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড়গুলোকে বলা হয় হারিকেন, যার গতিবেগ ঘন্টায় ৭৪ মাইলের বেশি। এ হারিকেন নামকরণ হয়েছে ওই অঞ্চলের আদি অধিবাসী মায়াদের ঝড়বৃষ্টির দেবতা 'হুরাকানের'

নাম থেকে।
অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড়কে বলা হয় 'টাইফুন'। এই টাইফুন নামটা এসেছে চীনা ভাষা taaifung ev taifeng থেকে, যার অর্থ শক্তিশালী বায়ু।

আমরা যাকে তুফান বলি আরবরাও একে তুফান বলেই ডাকে। আরবের গ্রিক মিথলজির বায়ুদৈত্য *tuphon* থেকে ঝড়ের নামকরণ হয় তুফান।
বর্তমানে আমরা যেসব ঘূর্ণিঝড়ের নাম শুনেছি–হুদহুদ, চপলা, সিডর, আইলা, তিতলি, নার্গিস, ফণী, বুলবুল, আম্পান।
অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে ঝড়ের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম কেন? ঝড় তো ঝড়ই। এর আবার নাম দেওয়ার প্রয়োজন কী? এসব নাম কেন দেয়, কারা নামগুলো নির্ধারণ করে, কীভাবে করে।

প্রতিটি বস্তুরই সাধারণ নাম থাকা সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট নাম থাকতে হয়। যেমন বাড়িতে প্রতিটা আমগাছের একেকটা নাম আছে। কোনোটার নাম বাটুইলা গাছ, কোনোটা বা কাঁচামিঠা, কোনোটা সিন্দুইরা, কোনোটার নাম চারা গাছ, কোনোটা জাম্বুইনা, আবার কোনোটা চুকাইরা গাছ প্রভৃতি। এসব নামের সুবিধে হলো গাছগুলো (আম) চিনতে সুবিধে হয়।
ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণের সুবিধে হলো–কখন কোথায় কোন ঝড় হয়, তা নিয়ে বিভ্রান্তি এড়ানো। ঝড়ের নাম থেকেই বোঝা যায় এটা কবে কোথায় হয়েছিল। এছাড়া আবহাওয়া স্টেশনগুলো থেকে সংগৃহীত ঝড়ের তথ্য সবাইকে জানানো, সমুদ্র উপকূলে সবাইকে সতর্ক করা, বিভিন্ন সংকেত এবং জলযানগুলোর জন্য ঝড়ের খবর খুব সহজভাবে আদান-প্রদান করা হয় ঝড়ের নাম ধরে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Meteorological Organization) আঞ্চলিক কমিটি তৈরি করে সমুদ্রের ওপর ভিত্তি করে। যেমন–উত্তর ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ঝড়ের নামকরণ করবে WMO-এর আঞ্চলিক কমিটির ৮টি সদস্য রাষ্ট্র–বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও ওমান। এদের একত্রে স্কেপে বলা হয়। স্কেপের স্পেশালাইজড মেটিওরোলজিক্যাল কেন্দ্র ভারতের দিল্লি।

২০০০ সালে স্কেপের প্রস্তাবানুযায়ী স্কেপের ৮টি সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে ৮টি করে মোট ৬৪টি নাম জমা নেয় সংস্থাটির আঞ্চলিক ট্রপিক্যাল সাইক্লোন কমিটি।

NORTHERN INDIAN OCEAN CYCLONE NAMES

Contributors	List 1	List 2	List 3	List 4	List 5	List 6	List 7	List 8
Bangladesh	Onil	Ogni	Nisha	Giri	Helen	Chapala	Ockhi	Fani
India	Agni	Akash	Bijli	Jal	Lehar	Megh	Sagar	Vayu
Maldives	Hibaru	Gonu	Aila	Keila	Madi	Roanu	Mekunu	Hikaa
Myanmar	Pyarr	Yemyin	Phyan	Thane	Nanauk	Kyant	Daye	Kyarr
Oman	Baaz	Sidr	Ward	Murjan	Hudhud	Nada	Luban	Maha
Pakistan	Fanoos	Nargis	Laila	Nilam	Nilofar	Vardah	Titli	Bulbul
Sri Lanka	Mala	Rashmi	Bandu	Viyaru	Ashobaa	Maarutha	Gaja	Pawan
Thailand	Mukda	Khai Muk	Phet	Phailin	Komen	Mora	Phethai	Amphan

স্কেপের কমিটি জমা নেওয়া নামের তালিকা থেকে ঘূর্ণিঝড়ের নামের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়গুলোর জন্য সদস্য দেশগুলো আগেই বিভিন্ন নাম প্রস্তাব করে রাখে। যখন ঝড় হয় তখন ওই তালিকা থেকে নামগুলো ব্যবহার করা হয়। ৭ নভেম্বর ২০১৯ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বুলবুল নামটি দিয়েছিল পাকিস্তান। এর আগে হওয়া ঘূর্ণিঝড় ফণী নামটি দিয়েছিল বাংলাদেশ। ঘূর্ণিঝড় আইলা নামটি দিয়েছিল মালদ্বীপ, তিতলি নামটি দিয়েছিল পাকিস্তান। বর্তমানে তালিকার শেষ স্তম্ভ থেকে নাম বাছাই হচ্ছে ফলে এই অঞ্চলে পরবর্তী যে সাইক্লোন উৎপন্ন হবে তার নাম হবে বায়ু, এই নামটি দিয়েছে ভারত। আঞ্চলিক কমিটির কাছে ঝড়ের নামকরণের জন্য বাংলাদেশের দেওয়া নামগুলো–অনিল, অগ্নি, নিশা, গিরি, হেলেন, চপলা, অক্ষি, ফণী।

আগে বেশির ভাগ ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করা হতো নারীদের ঘিরে। যেমন–নার্গিস, বিজলি, রেশমী, ফণী, ক্যাটরিনা প্রভৃতি। বর্তমানে তালিকায় সমভাবে পর্যায়ক্রমে নারী ও পুরুষের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য বর্তমানে বস্তু বা অন্য বিষয়ের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন–সিডর, মেঘ, বায়ু, সাগর ইত্যাদি।

বর্তমানে ঝড়ের নাম সংক্ষিপ্ত এবং সহজ করে রাখা হয়। যেন সহজে প্রচার করা, উচ্চারণ করা এবং মনে রাখা যায়।
যেহেতু ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস ও মৃত্যুর শঙ্কা থাকে, তাই একবার একটি নামকরণ করা হলে, দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করা হয় না।

প্রায় সব ধরনের এনার্জি মানুষ কাজে লাগাতে পারলেও ঘূর্ণিঝড়ের যে বিপুল এনার্জি, তা মানুষ আজও কাজে লাগাতে পারেনি। অদূর ভবিষ্যতে এ এনার্জি মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হোক। ঘূর্ণিঝড়সহ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ জয় করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবকল্যাণে আরও ব্যাপক ব্যবহার হোক, আরও সহজতর হোক মানুষের জীবনে এটাই প্রত্যাশা।

প্রবন্ধকার : বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কালীহাতি কলেজ, টাঙ্গাইল।

বাংলাদেশি বিজ্ঞানী এবং তাঁদের আবিষ্কার

ড. ইসতিয়াক মইন সৈয়দ

জীবন ও বিজ্ঞান যেন একই সূত্রে গাঁথা। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের জীবন হয়েছে সুন্দর, সহজ আর গতিময়। বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যা, ওষুধ, গণিত, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। এই নিবন্ধটিতে ইতিহাসজুড়ে বিখ্যাত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক এবং তাঁদের বিস্ময়কর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জগদীশ চন্দ্র বসু

জন্ম : ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮; ময়মনসিংহ, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যু : ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭, গিরিডি, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত

জীবনী : জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি অঞ্চলের ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রাম তাঁর পরিবারের প্রকৃত বাসস্থান ছিল। তাঁর পিতা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ভগবান চন্দ্র বসু তখন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জগদীশ চন্দ্রের প্রথম স্কুল ছিল ময়মনসিংহ জিলা স্কুল। জগদীশ কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে পড়াশোনা করে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৮৮০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যেই লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি জমান, কিন্তু অসুস্থতার কারণে বেশি দিন এই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। পরে তিনি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে ট্রাইপস পাস করেন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি সম্পন্ন করেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশ ভারতে ফিরে আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ইউরোপীয় অধ্যাপকদের অর্ধেক বেতনেরও কম অর্থ লাভ করতেন। এর প্রতিবাদে তিনি তিন বছর অবৈতনিকভাবেই অধ্যাপনা চালিয়ে যান। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসে জগদীশ যেসব গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণা পত্রগুলোর সূত্র ধরেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

গবেষণা : অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসের গবেষণার মধ্যে মুখ্য ছিল অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোনো তার ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা প্রেরণে সফলতা পান। তিনি সর্বপ্রথম প্রায় ৫ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ তৈরি করেন। এ ধরনের তরঙ্গকেই বলা হয়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাউক্রোওয়েভ। আধুনিক রাডার, টেলিভিশন এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত এর মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান ঘটে থাকে। তিনি

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের সাদৃশ্য নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দেখান যে উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন উদ্দীপনার (যেমন, ক্ষত, রাসায়নিক এজেন্ট) পরিবহন বৈদ্যুতিক প্রকৃতির, যা আগে রাসায়নিক প্রকৃতির বলে মনে করা হতো। এছাড়া তিনি বিভিন্ন উদ্দীপনার ওপর রাসায়নিক ইনহিবিটর্স এবং তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা : নাইটহুড, ১৯১৬; রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, ১৯২০; ভিয়েনা একাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য, ১৯২৮; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর ১৪তম অধিবেশনের সভাপতি, ১৯২৭; ভারতীয় সাম্রাজ্যের অর্ডার অব কম্প্যানিয়ন (সিআইই, ১৯০৩); ভারতের স্টার অব অর্ডার অব কম্প্যানিয়ন (সিএসআই, ১৯১২) ইত্যাদি।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

জন্ম : ২ আগস্ট ১৮৬১, রাড়ুলী, খুলনা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (বর্তমান বাংলাদেশ), ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যু : ১৬ জুন ১৯৪৪, কলকাতা, ভারত

জীবনী : পি সি রায় বাংলাদেশের খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ভুবনমোহিনী দেবী এবং পিতা হরিশ চন্দ্র রায়। হরিশচন্দ্র রায় স্থানীয় জমিদার ছিলেন। বনেদি পরিবারের সন্তান প্রফুল্ল চন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই সব বিষয়ে অত্যন্ত ভুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। তাঁর পড়াশোনা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত এম ই স্কুলে। তিনি কলকাতায় অ্যালবার্ট স্কুল থেকে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে সেখান থেকে এফএ পরীক্ষায় (ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি) দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি থেকে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিএসসি পাস করেন। পরবর্তীকালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ও ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় ২৪ বছর তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন।

গবেষণা : নিজের বাসভবনে দেশীয় ভেষজ গাছ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি তাঁর গবেষণাকর্ম আরম্ভ করেন। তাঁর এই গবেষণাস্থল থেকেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সৃষ্টি হয়, যা ভারতবর্ষের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট ($HgNO_2$) আবিষ্কার করেন, যা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি তার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। তিনি তার সমগ্র জীবনে মোট ১২টি যৌগিক লবণ এবং ৫টি থায়োএস্টার আবিষ্কার করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা : শিক্ষকতার জন্য তিনি 'আচার্য' হিসেবে আখ্যায়িত, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে তৃতীয়বারের মতো ইংল্যান্ড যান এবং সেখান থেকেই সিআইই লাভ করেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়। এ ছাড়া ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে মহীশুর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইট উপাধি লাভ করেন।

কাজি আজিজুল হক

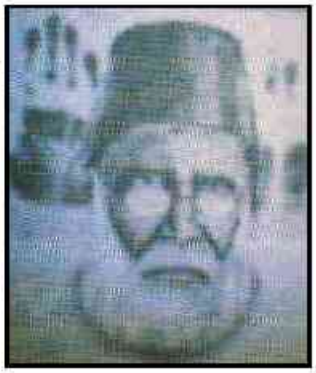

জন্ম : ১৮৭২; খুলনা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (বর্তমান বাংলাদেশ), ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যু : ১৯৩৫; উত্তর চম্পারান; বিহার; ব্রিটিশ ভারত

জীবনী : খান বাহাদুর কাজি আজিজুল হক ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশে কর্মরত একজন কর্মকর্তা। তিনি ব্রিটিশ ভারতের খুলনা জেলার ফুলতলার পয়োগ্রাম কসবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হস্তছাপের মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের ছাত্র ছিলেন। চাকরিতে পদোন্নতি পেয়ে তিনি পুলিশের এসপি হয়েছিলেন।

গবেষণা : ১৮৯২ সালে তিনি কাজ শুরু করেন কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। তখন অ্যানথ্রোপমেট্রি (মানবদেহের আকৃতি) পদ্ধতিতে অপরাধীদের শনাক্ত করার কাজ চলত। গণিতের ছাত্র এবং সদ্য সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি পাওয়া আজিজুল হক অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি যে পদ্ধতি উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করলেন, তা-ই 'হেনরি সিস্টেম' বা 'হেনরি পদ্ধতি' নামে পরিচিত হয়। ২০০১ সালে প্রকাশিত কলিন বিভান তাঁর ফিঙ্গার প্রিন্টস গ্রন্থে কাজি আজিজুল হকের গবেষণার মৌলিকত্ব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন, অ্যানথ্রোপমেট্রিক পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আজিজুল হক ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হন। ফলে নিজেই হাতের ছাপ তথা ফিঙ্গারপ্রিন্টের শ্রেণিবিন্যাসকরণের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি উদ্ভাবন করেন একটা গাণিতিক ফর্মুলা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপের ধরনের ওপর ভিত্তি করে ৩২টি থাক বানান। সেই থাকের ৩২টি সারিতে সৃষ্টি করেন ১০২৪টি খোপ। বিভান আরও জানাচ্ছেন, ১৮৯৭ সাল নাগাদ হক তাঁর কর্মস্থলে সাত হাজার ফিঙ্গারপ্রিন্টের বিশাল এক সংগ্রহ গড়ে তোলেন। তাঁর সহজ-সরল এই পদ্ধতি ফিঙ্গারপ্রিন্টের সংখ্যা লাখ লাখ হলেও শ্রেণিবিন্যাস করার কাজ সহজ করে দেয়।

পুরস্কার ও সম্মাননা : কাজের পুরস্কার হিসেবে আজিজুল হককে দেওয়া হয়েছিল 'খান বাহাদুর' উপাধি, পাঁচ হাজার টাকা এবং ছোটখাটো একটা জায়গির। এ ছাড়া ব্রিটেনের 'দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট সোসাইটি' ফেলির উদ্যোগে চালু করেছে 'দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট সোসাইটি আজিজুল হক অ্যান্ড হেমচন্দ্র বোস প্রাইজ'। যাঁরা ফরেনসিক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবেন, এ পুরস্কার দেওয়া হবে তাঁদেরই।

মেঘনাদ সাহা

জন্ম : ৬ অক্টোবর ১৮৯৩; ঢাকা, ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যু : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ (৬২ বছর); দিল্লি, ভারত

জীবনী : মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর ঢাকার কাছে শ্যাওড়াতলী গ্রামে। গরিব ঘরে জন্ম

তাঁর। অর্থাভাবে বহু প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং পরে ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের সহপাঠী এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তারপরে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণা : তিনি পদার্থবিজ্ঞানে থার্মাল আয়নাইজেসন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিখ্যাত। তাঁর আবিষ্কৃত সাহা আয়োনাইজেসন সমীকরণ নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মাবলি ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

পুরস্কার ও সম্মাননা : তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো ছিলেন। তাঁর নামানুসারেই কলকাতায় সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস প্রতিষ্ঠিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম : ১ জানুয়ারি ১৮৯৪; কলকাতা

মৃত্যু : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ (৮০ বছর)

জীবনী : সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে বিবেচিত হয়। ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথ কর্মজীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন বৃহত্তর বাংলার তিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন কলকাতা, ঢাকা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করার পর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে আইএসসি পাস করেন প্রথম হয়ে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক এবং ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে একই ফলাফলে মিশ্র গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে দুই বছরের ইউরোপ সফর থেকে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং অধ্যাপক পদে উন্নীত হন ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। বসু ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন এবং দেশ বিভাগ আসন্ন হলে তিনি কলকাতায় ফিরে যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্বভারতীতে উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসু তড়ীয় পদার্থবিজ্ঞান ও এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। এ সময়ে বসু প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তেজস্ক্রিয়তা নীতি ক্ল্যাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই প্রতিপাদন

করে একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সদৃশ কণার সাহায্যে দশার সংখ্যা গণনার একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশ করার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বসু তা সরাসরি আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে প্রেরণ করেন, তিনি প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেই তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বসুর পক্ষে তা Zeitschrift fur Physik সাময়িকীতে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আইনস্টাইন এই ধারণাটি গ্রহণ করে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট-এর গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা : ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে মনোনীত করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম এবং ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে সত্যেন বসু অধ্যাপক (Bose Professor) পদ রয়েছে। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা শহরে তাঁর নামে সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র নামক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

কাজী মোতাহার হোসেন

জন্ম : ৩০ জুলাই ১৮৯৭; বাগমারা, জেলা (ব্রিটিশ ভারত)

মৃত্যু : ৯ অক্টোবর, ১৯৮১ (৮৪ বছর); ঢাকা (বাংলাদেশ)

জীবনী : কাজী মোতাহার হোসেনের পিতা কাজী গওহরউদ্দীন আহমদ ছিলেন সেটেলমেন্টের আমিন। মায়ের নাম তাসিরুন্নেসা। ১৯২১ সালে এমএ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালীন কলকাতার তালতলা নিবাসী মোহাম্মদ ফয়েজুর রহমানের কন্যা সাজেদা খাতুনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। তাঁদের সংসারে চার পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। এর মধ্যে সনৃজীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, কাজী আনোয়ার হোসেন, কাজী মাহবুব হোসেন প্রমুখ রয়েছেন। ১৯১৫ সালে তিনি কুষ্টিয়া মুসলিম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে তিনি ভর্তি হন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১৭ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ পরীক্ষায় বাংলা ও আসাম জোনে প্রথম স্থান অর্জন করে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান নিয়ে এমএ পাস করেন। উল্লেখ্য, সে বছর কেউ প্রথম শ্রেণি পাননি। ১৯৩৮ সালে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। যুগপৎভাবে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে পিএইচডি করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজে ছাত্র থাকাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডেমনেস্ট্রেটর হিসেবে চাকরি শুরু করেন এবং একই বিভাগে ১৯২৩ সালে একজন সহকারী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। কাজী মোতাহার হোসেনের নিজ উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানে এমএ কোর্স চালু হয় এবং তিনি এই নতুন বিভাগে যোগ দেন। তিনি ১৯৫১ সালে পরিসংখ্যানে একজন রিডার ও ১৯৫৪ সালে অধ্যাপক হন। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের তিনি প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি ১৯২৯ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানে একক

চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।

গবেষণা : তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্টস'। তিনি 'হোসেন চেইন রুল' নামক একটি নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন। বস্তুত তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) তিনিই প্রথম স্বীকৃত পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা : ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৭৯ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি দ্বারা সম্মানিত করে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে সম্মানিত করে। কাজী মোতাহার হোসেন ভবন নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স অ্যানেক্স ভবনের নামকরণ করা হয়।

মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা

জন্ম : ১ ডিসেম্বর, ১৯০০; মাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ব্রিটিশ ভারত।

মৃত্যু : ৩ নভেম্বর, ১৯৭৭ (৭৬ বছর); ঢাকা, বাংলাদেশ।

জীবনী : মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ছিলেন একজন বাংলাদেশি রসায়নবিদ, গ্রন্থকার এবং শিক্ষাবিদ। তিনি কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২৫ সালে রসায়নে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এমএসসি পাস করেন। পরবর্তীকালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২৯ সালে রসায়নে ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি এ কলেজে বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৪৬ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন।

দেশ বিভাগের পর ড. কুদরাত-এ-খুদা পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং জনশিক্ষা পরিচালকের দায়িত্ব নেন (১৯৪৭-১৯৪৯)। ১৯৫২-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারসমূহের পরিচালক ছিলেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় ড. কুদরাত-এ-খুদা তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নাম অনুসারে পরবর্তীকালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটির নাম রাখা হয় ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট।

গবেষণা : ড. কুদরাত-এ-খুদা স্টেরিও রসায়ন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বনৌষধি, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, পাট, লবণ, কাঠকয়লা, মৃত্তিকা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের ১৮টি আবিষ্কারের পেটেন্ট রয়েছে, যার মধ্যে ৯টি পাটসংক্রান্ত।

এর মধ্যে পাট ও পাটকাঠি থেকে রেয়ন, পাটকাঠি থেকে কাগজ এবং রস ও গুড় থেকে মল্ট ভিনেগার আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত গবেষণামূলক পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রায় ১২০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

পুরস্কার ও সম্মাননা : তিনি একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (মরণোত্তর) সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

অমল কুমার রায়চৌধুরী

জন্ম : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, বিশাল, পূর্ব বাংলা, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমান বাংলাদেশ)

মৃত্যু : ১৮ জুলাই, ২০০৫ (৮১ বছর)

জীবনী : আপেক্ষিকতার বিশ্বতত্ত্বে, বিশেষ করে রায়চৌধুরী সমীকরণের জন্য তিনি বিখ্যাত। রায়চৌধুরী ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন, তিনি ছিলেন গণিতের শিক্ষক। বাবাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই ছোটবেলা থেকেই অমল গণিত বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

গবেষণা : তাঁর উদ্ভাবিত রায়চৌধুরী সমীকরণ থেকে চতুর্মাত্রিক জগৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বিবর্তিত হয়, সেটার ব্যাখ্যা মেলে। এই সমীকরণ থেকে অমল রায়চৌধুরীই প্রথম ধারণা দেন যে সিঙ্গুলারিটি এড়িয়ে যাওয়া আমাদের জন্য সম্ভব নয়। পরে ১৯৬০-৭০-এর দিকে স্টিফেন হকিং এবং রজার পেনরোজ, রায়চৌধুরী সমীকরণের ওপর ভিত্তি করেই এ ব্যাপারটা গাণিতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

ফজলুর রহমান খান

জন্ম : ৩ এপ্রিল ১৯২৯; শিবচর, মাদারীপুর, বাংলাদেশ

মৃত্যু : ২৭ মার্চ ১৯৮২; জেদ্দা, সৌদি আরব

জীবনী : তিনি ১৯৪৪ সালে আরমানিটোলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তিনি ঢাকায় ফিরে এসে তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বাকি পরীক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫২ সালে যুগপৎ সরকারি বৃত্তি ও ফুল ব্রাইট বৃত্তি নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সেখানে ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট অরবানা শ্যাম্পেইন থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তত্ত্বীয় ও ফলিত মেকানিকসে যুগ্ম

এমএস করার পর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জনের পরপরই তিনি আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৫৬ সালে দেশে ফিরে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পূর্ব পদে যোগদান করেন।

গবেষণা : শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার তাঁর অনন্য কীর্তি। তিনি ১৯৭২ সালে 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ রেকর্ড'-এ ম্যান অব দ্য ইয়ার বিবেচিত হন এবং পাঁচবার স্থাপত্যশিল্পে সবচেয়ে বেশি অবদানকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত হওয়ার গৌরব লাভ করেন। তিনি মুসলিম স্থাপত্য বিষয়ের ওপর নানা ধরনের গবেষণা করেছেন। ড. খান টিউব ইন টিউব নামে স্থাপত্যশিল্পের এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যার মাধ্যমে অতি উচ্চ (কমপক্ষে একশত তলা) ভবন স্বল্প খরচে নির্মাণ সম্ভব। গগনচুম্বী ভবনের ওপর সাত খণ্ডে প্রকাশিত একটি পুস্তকের তিনি সম্পাদনা করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা : নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, লি হাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইস ফেডারেল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, ১৯৯৯ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (মরণোত্তর)। ১৯৯৮ সালে শিকাগো শহরের সিয়ার্স টাওয়ারের পাদদেশে অবস্থিত জ্যাকসন সড়ক পশ্চিম পার্শ্ব এবং ফ্রাঙ্কলিন সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বের সংযোগস্থলটিকে নামকরণ করা হয় 'ফজলুর আর. খান ওয়ে' ইত্যাদি।

জামাল নজরুল ইসলাম

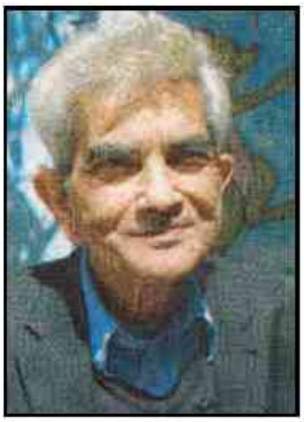

জন্ম : ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯; ঝিনাইদহ জেলা, বাংলাদেশ

মৃত্যু : মার্চ ১৬, ২০১৩ (৭৪ বছর); চট্টগ্রাম

জীবনী : জামাল নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে তিনি নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এখানে পড়ার সময়ই গণিতের প্রতি তাঁর অন্য রকম ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। নবম শ্রেণিতে ওঠার পর পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে গিয়ে ভর্তি হন লরেন্স কলেজে। এই কলেজ থেকেই তিনি সিনিয়র কেমব্রিজ ও হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তে যান। সেখান থেকে বিএসসি অনার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায়োগিক গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান থেকে আবারও স্নাতক ডিগ্রি (১৯৫৯) অর্জন করেন। তারপর এখান থেকেই মাস্টার্স (১৯৬০) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রায়োগিক গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে এসসিডি (ডক্টর অব সায়েন্স) ডিগ্রি অর্জন করেন।

গবেষণা : তাঁর গবেষণার বিষয় ফলিত গণিত, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, মহাকর্ষ তত্ত্ব, সাধারণ আপেক্ষিকতা, গাণিতিক বিশ্বতত্ত্ব ও কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৫০টির বেশি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, বই এবং জনপ্রিয় নিবন্ধ লিখেছেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স'

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। দ্রুত বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। পরের বছর কেমব্রিজ থেকেই প্রকাশিত হয় 'ক্ল্যাসিক্যাল জেনারেল রিলেটিভিটি।' তাঁর গবেষণা আইনস্টাইন-পরবর্তী মহাবিশ্ব গবেষণায় বিরাট অবদান রেখেছে। তিনি এই ধারায় গবেষণা অব্যাহত রেখে পরবর্তীকালে লেখেন 'ফার ফিউচার অব দ্য ইউনিভার্স' বা মাহাবিশ্বের দূরবর্তী ভবিষ্যৎ। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ কখনো এক সরলরেখায় এলে পৃথিবীর ওপর তার প্রভাব পড়বে কি না, তা নিয়ে কাজ করেছেন তিনি।

পুরস্কার ও সম্মাননা : বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি ১৯৮৫ সালে তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৯৪ সালে তিনি ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মেডেল পান। ১৯৯৮ সালে ইতালির আবদুস সালাম সেন্টার ফর থিওরিটিকাল ফিজিকসে থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্স অনুষ্ঠানে তাঁকে মেডাল লেকচার পদক দেওয়া হয়। এ ছাড়া ২০০১ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

আব্দুস সাত্তার খান

জন্ম : ১৯৪১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, বাংলাদেশ

মৃত্যু : ৩১ জানুয়ারি, ২০০৮ (৬৭ বছর) ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

জীবনী : আব্দুস সাত্তার খান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত মহাকাশ গবেষক। কর্মজীবনে তিনি নাসা, ইউনাইটেড টেকনোলজিসের প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি এবং অ্যালস্টমে (সুইজারল্যান্ড) কাজ করেছেন। তিনি রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়াশোনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগ থেকে ১৯৬২ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৬৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৬৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করতে যান এবং ১৯৬৮ সালে রসায়নের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ওই বছরই তিনি ধাতব প্রকৌশল নিয়ে গবেষণা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।

গবেষণা : তিনি নাসা ইউনাইটেড টেকনোলজিস ও অ্যালস্টমে কাজ করার সময়ে ৪০টির বেশি সংকর ধাতু উদ্ভাবন করেছেন। এই সংকর ধাতুগুলো ইঞ্জিনকে আরও হালকা করেছে, যার ফলে উড়োজাহাজের পক্ষে আরও দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং ট্রেনকে আরও গতিশীল করেছে। তার উদ্ভাবিত সংকর ধাতুগুলো এফ-১৬ ও এফ-১৭ যুদ্ধবিমানের জ্বালানি সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি ৩১টি প্যাটেন্টের অধিকারী।

পুরস্কার ও সম্মাননা : ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির নির্বাচিত ফেলো; যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটি অব মেটালসের সদস্য; ১৯৮৬ সালে ইউনাইটেড টেকনোলজিস স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড; ১৯৯৪ সালে পান 'ইউনাইটেড টেকনোলজিস রিসার্চ সেন্টার অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স' পদক ইত্যাদি।

আবুল হুসসাম

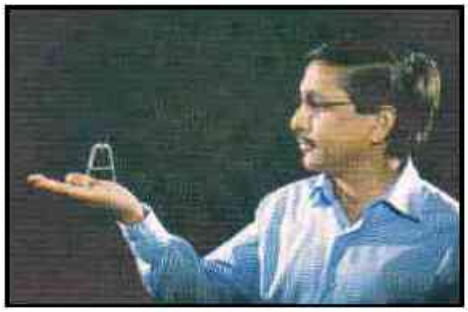

জন্ম : ১৯৫২ সাল; কুষ্টিয়া; বাংলাদেশ।

জীবনী : অধ্যাপক আবুল হুসসাম একজন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী, তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে কম খরচে ভূগর্ভস্থ আর্সেনিকযুক্ত পানি পরিশোধনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তিনি বর্তমানে জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটি, ফেয়ারফ্যাক্স, ভার্জিনিয়ার রসায়নের অধ্যাপক। আবুল হুসসাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে ১৯৭৫ সালে বিএসসি এবং ১৯৭৬ সালে এমএসসি সম্পন্ন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করেন। ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যানালিটিক্যাল রসায়নে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

গবেষণা : তিনি বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতীয় ভূখণ্ডের ভূগর্ভস্থ পানিতে থাকা আর্সেনিক ও এর প্রতিকার নিয়ে গবেষণা করেন। হুসসাম আর্সেনিক নিয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম শুরু করেন ১৯৯৩ সাল থেকে। নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে তিনি পানিতে থাকা আর্সেনিকের মাত্রা প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করাতে সক্ষম যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রটি মূলত একটি ফিল্টার বা ছাঁকনিবিশেষ, এই বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রে বালু, কাঠ কয়লা, ক্ষুদ্র ইটের খোয়া ও কাস্ট আয়রন (ঢালাই লোহা) ব্যবহার করা হয়। ফিল্টার বা ছাঁকনিটি আর্সেনিকযুক্ত পানির প্রায় সমস্ত আর্সেনিক অবমুক্ত করার ক্ষমতা রাখে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও প্রখ্যাত জার্নালে অধ্যাপক হুসসামের প্রায় শতাধিক প্রকাশনা রয়েছে।

পুরস্কার ও সম্মাননা : সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯; ন্যাশনাল একাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ পুরস্কার, স্বর্ণপদক, ২০০৭; গ্লোবাল হিরোস অব দ্য এনভায়রনমেন্ট পুরস্কার, ২০০৭ ইত্যাদি।

আতাউল করিম

জন্ম : ৪ মে, ১৯৫৩ (বয়স ৬৩); বড়লেখা উপজেলা, সিলেট, বাংলাদেশ।

জীবনী : বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের বড়লেখার মিশন হাউসে জন্মগ্রহণ করেন আতাউল করিম। বাবা মোহাম্মদ আবদুস শুকুর পেশায় ডাক্তার ছিলেন। তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডে প্রথম শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সিলেট এমসি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে বিএসসি (অনার্স) ডিগ্রি লাভের পর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার অব সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার অব সায়েন্স এবং পিএইচডি করেন

ইউনিভার্সিটি অব অলাবামা থেকে যথাক্রমে ১৯৭৮, ১৯৭৯ ও ১৯৮১ সালে। পড়ালেখা শেষ করে তিনি আরকানস বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার নরফোকে অবস্থিত ওল্ড ডোমিনিয়ন ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট (গবেষণা) হিসেবে কর্মরত।

গবেষণা : তিনি ৬০টিরও বেশি এমএস/পিএইচডি গবেষণা তত্ত্বাবধান করেন। তিনি ১৯টি বই, ৮টি বইয়ের অধ্যায় এবং ৩৬৫টি গবেষণাপত্র রচনা করেন। তাঁর নেতৃত্বে একটি টিম উড়ন্ত ট্রেনের প্রোটোটাইপ নির্মাণ করেন। ট্রেনটি চৌম্বক উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে চলবে। ট্রেনটি নির্মাণে শুধু ১,২০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

পুরস্কার ও সম্মাননা : এনসিআর স্টেকহোল্ডার অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৯); নাসা টেক ব্রিফ অ্যাওয়ার্ড (১৯৯০); আউটস্ট্যান্ডিং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৪); আউটস্ট্যান্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৮) ইত্যাদি।

মাকসুদুল আলম

জন্ম : ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৪; ফরিদপুর, বাংলাদেশ

মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪; যুক্তরাষ্ট্র

জীবনী : ড. মাকসুদুল আলম ছিলেন একজন বাংলাদেশি জিনতত্ত্ববিদ। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাটের জিন নকশা উন্মোচিত হয়। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের ঘোষণা দেন। তার পিতা দলিলউদ্দিন আহমেদ ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) একজন কর্মকর্তা এবং তার মা লিরিয়ান আহমেদ ছিলেন একজন সমাজকর্মী ও শিক্ষিকা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে তার পিতা শহীদ হন। গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে স্বাধীনতার পর মাকসুদুল আলম চলে যান রাশিয়ায়। সেখানে মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অণুপ্রাণবিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর (১৯৭৯) ও পিএইচডি (১৯৮২) সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন বাই প্রডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টারে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৯২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ২০০১ সাল থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে যান।

গবেষণা : ২০০০ সালে তিনি ও তাঁর সহকর্মী 'রেন্ডি লারসেন' প্রাচীন জীবাণুতে মায়োগেন্ডাবিনের মতো এক নতুন ধরনের প্রোটিন আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের সুবাদে মাকসুদের খ্যাতি ও দক্ষতা সবার নজরে আসে। তিনি হাওয়াইয়ান পেঁপের জিন নকশা উন্মোচন করেন। এ কাজ সম্পন্ন করার পর বিজ্ঞান সাময়িকী

লেচারের প্রচ্ছদে স্থান পান তিনি। এরপর মালয়েশিয়ায় রাবারের জিন নকশা উন্মোচনের কাজেও তিনি সফল হন। পরে তিনি মনোনিবেশ করেন পাটের জিন নকশা উন্মোচনে।

পুরস্কার ও সম্মাননা : বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০১৬ সালের স্বাধীনতা পদক প্রদান করে।

শাহ এম ফারুক

জন্ম : ১৯৫৬, যশোর, বাংলাদেশ।

জীবনী : তিনি যশোর জিলা স্কুল, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, যশোর সরকারি এম এম কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে বিএসসি ও এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইউ কের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি পান। ফারুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি পরে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আইসিডিডিআরবিতে যোগ দেন এবং আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন।

গবেষণা : ড. শাহ এম ফারুক এবং তাঁর গবেষণা দল কলেরা রোগের কারণ আবিষ্কার করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া কীভাবে কলেরার মতো ভয়ংকর রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

পুরস্কার ও সম্মাননা : ২০০৫ সালের TWA বর্ষসেরা বিজ্ঞানী নির্বাচিত হন, TWAS ফেলো, বিজ্ঞান বিশ্ব একাডেমি এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের ফেলো ইত্যাদি।

শুভ রায়

জন্ম : ১০ নভেম্বর ১৯৬৯ (বয়স ৪৭), ফটিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

জীবনী : শুভ রায় একজন বাংলাদেশি-মার্কিন বিজ্ঞানী এবং কৃত্রিম কিডনির আবিষ্কারক। তার পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার রোসাংগিরিতে। পাঁচ বছর বয়সে ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরীর একটি বিদ্যালয়ে নার্সারিতে শুভ রায়কে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বাবা অশোক নাথ রায়ের পেশাগত কারণে ১৯৭৪ সালে তাদের উগান্ডায় চলে যেতে হয়। উগান্ডার জিনজা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল থেকে সেকেন্ডারি পাস করেছেন শুভ রায়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান শুভ। কম্পিউটার বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওর মাউন্ট ইউনিয়ন কলেজ থেকে। তিনি ১৯৯৫ সালে কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি থেকে তড়িৎ প্রকৌশল ও ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স এবং ২০০১ সালে তড়িৎ প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং

বিভাগে প্রজেক্ট স্টাফ হিসেবে যোগ দেন। ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ক্লিভল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটির ফলিত বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের সহকারী অধ্যাপক এবং কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির তড়িৎ প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

গবেষণা : তিনি কৃত্রিম কিডনির সহ-আবিষ্কারক। এছাড়া তিনি তারবিহীন স্ট্রেস ও চাপ পরিমাপক মাইক্রো সেন্সর আবিষ্কার করেন, যা মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচারের সময় হাড়ের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়। তিনি উচ্চ রিসোলিউশনের ছোট আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং প্রযুক্তির যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যা ধমনিতে স্থাপন করা যায়।

পুরস্কার ও সম্মাননা : সিনিয়র ফিজিকস প্রাইজ, মাউন্ট ইউনিয়ন কলেজ; এমআইটি-র TR100 ইত্যাদি।

এম জাহিদ হাসান

জীবনী : এম জাহিদ হাসান একজন বাংলাদেশি পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। অ্যাডভোকেট রহমত আলী ও গৃহিণী নাদিরা বেগমের দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে জাহিদ সবার বড়। ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে এসএসসিতে সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বিতীয় ও ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৮৮ সালে এইচএসসিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন জাহিদ। অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে পরে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন। এই সময় তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর আমন্ত্রণ পান। এরই মধ্যে প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী তাঁর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

গবেষণা : তাঁর নেতৃত্বে একটি দল নতুন একটি বস্তু-দশা যার নাম দেওয়া হয়েছে 'টপলোজিক্যাল ইনসুলেটর' বা 'স্থানিক অন্তরক' আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া তিনি ভরহীন Quasi Particle, Weyl Fermion আবিষ্কার করেন। তাঁর প্রকাশিত শতাধিক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের দুই-তৃতীয়াংশই ছাপা হয়েছে নেচার, ফিজিকস টুডে, সায়েন্স ফিজিক্যাল রিভিউর মতো বনেদি, অভিজাত ও বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকীতে।

বাংলাদেশের আরও অনেক বিখ্যাত এবং উদীয়মান বিজ্ঞানী থাকলেও, এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

যুগে যুগে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যেমন তাঁদের আবিষ্কার দ্বারা মানবকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন তেমনি ভবিষ্যতেও তাঁরা কাজ করে যাবেন। আর আমরা আশা করি তাঁদের এই যাত্রায় বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা আরও বেশি করে অবদান রাখবেন।

সূত্র : নিবন্ধের বিভিন্ন অংশ উইকিপিডিয়া এবং উইকিপিডিয়াতে উল্লেখিত তথ্যসূত্র থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। বিজ্ঞানীদের ছবিসমূহ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

প্রবন্ধকার : অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জিনপ্রযুক্তির যত চমক

ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

জিনপ্রযুক্তি এখন আর কোনো কল্পনা নয়। মলিকুলার বায়োলজির অসামান্য সাফল্যের জন্য আজ জিনের গঠন ও এর কাজ সম্পর্কে অনেকটাই বিস্তৃত জানা সম্ভব হয়েছে এবং একে এখন এক জীবের ক্রোমোজোম থেকে কর্তন করে নিয়ে অন্য জীবকোষে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। এ রকম সংযোজন আজ আর পরীক্ষা পর্যায়ে নেই, বরং এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখন রুটিন কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিনপ্রযুক্তির বিকাশ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ জীবের মধ্যে জিন দেওয়া-নেওয়ার কাজটিকে তুলনামূলকভাবে বেশ সহজ সাধ্য করে তুলেছে। ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে জিন সংযোজন করে বেশ কতগুলো ফসলের কীট-প্রতিরোধী ও আগাছানাশক-প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মডিফাইড (জি এম) জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি মানুষের বেশ কিছু প্রোটিন বা এনজাইমজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে জিনপ্রযুক্তির এখন দেদার প্রয়োগ করা হচ্ছে। গোড়াতে ফসলের জি এম জাত উদ্ভাবনের কারণ ও জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ কৌশল নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়মে এক প্রজাতির এক গাছ থেকে আরেক গাছে প্রাকৃতিকভাবে পরাগায়নের মাধ্যমে জিন বিনিময়ের ঘটনা বেশ সাধারণ একটি বিষয়। পর-পরাগী ফসলে কখনো বায়ুর মাধ্যমে কখনো কীটপতঙ্গ বা পাখপাখালির মাধ্যমে এক গাছের পরাগরেণু অন্য গাছের গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পৌঁছে। এভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে ফুলের গঠন কাঠামো এবং গাছের লিঙ্গতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকায় গাছে গাছে পারস্পরিক পরাগরেণুর বিনিময় ঘটে থাকে। পরাগরেণু আসলে কোনো ফাঁপা বস্তু নয়। এর ভেতর লুকিয়ে থাকে কোনো জীবের তথ্য বহনকারী জিন। গাছের পুরুষ জননাঙ্গে পরাগধানীর ভেতর পরাগরেণু তৈরি হয় বলে এটি আসলে পুং জনন কোষ। ফলে পুং জনন কোষ অসংখ্য জিন বহন করে নিয়ে সংস্থাপিত হয় অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে। সেটি হলো আবার স্ত্রী জননাঙ্গের সর্ব শীর্ষ অংশ। অতঃপর পুরুষ আর স্ত্রী জনন কোষ গর্ভাশয়ে পরস্পর মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। আর এর ফলে সৃষ্টি হয় বীজ আর সৃষ্টি হয় ফল।

কৃত্রিম উপায়েও অনেক সময় বিজ্ঞানীরা এক গাছের পরাগরেণু ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য গাছের গর্ভমুণ্ডে সংস্থাপন করে দেন। একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন রকম গাছের মধ্যে সংকরায়ণ করে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছ উদ্ভাবনের জন্য এটা করা হয়। এভাবে সংকরায়ণ ও এদের বংশধরদের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন নানা রকম ফসলের জাত। একই পদ্ধতি অবলম্বন করে একই প্রজাতির ভিন্ন রকম পশুর মিলনের মাধ্যমে পশুতেও সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন রকম নতুন ব্রিড। এসব ফসলের জাত আর পশুর ব্রিড সারা বিশ্বে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক প্রযুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবেই ফসলের জাত এবং পশুর ব্রিড উদ্ভাবন করা হচ্ছে এক শতকেরও বেশি সময় ধরে। সনাতন এই পদ্ধতির একটি বড় সীমাবদ্ধতা এই যে, বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পরাগায়ন বা কৃত্রিম প্রজনন করতে পারছেন কেবল একই প্রজাতির ভিন্ন গাছে বা ভিন্ন পশুতে। একই প্রজাতির বাইরে বিজ্ঞানীরা কালেভদ্রে দুটি প্রজাতির মধ্যে বা দুটি গণের মধ্যে এ রকম কৃত্রিম পরাগায়ন বা কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন করতে পেরেছেন। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই দুটি প্রজাতির মধ্যে, দুই গণের মধ্যে বা দুই গোত্রের মধ্যে সংকরায়ন করে কোনো সন্তানই পাওয়া যায় না। ফলে দূর-সম্পর্কিত জীবের মধ্যে জিন

বিনিময়ের কোনো সনাতন পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের জানা নেই। সে কারণে অন্য জীবের কোনো কাঙ্ক্ষিত জিন অন্য আরেক জীবে সংযোজন করা এই কয়েক দশক আগেও সম্ভব হতো না।

বিজ্ঞানীরা তো আর বসে থাকার পাত্র নন। তার ওপর রয়েছে মানুষের বর্ধিত ও বহুমাত্রিক চাহিদা। ফলে কী করে এক জীবের জিন অন্য যেকোনো জীবে সংযোজন করা যায়, সে গবেষণায় তাঁরা নিয়োজিত হলেন। তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার ফলে কত সব জটিল জটিল বিষয় বিজ্ঞানীদের জানা সম্ভব হলো। জিনের অনুপুঙ্খ গঠন তাঁরা জানতে সক্ষম হলেন। ডিএনএর কতটুকু অংশ কেটে নিলে তবে একটি প্রকাশ উপযোগী জিন পাওয়া যায়, সেসবও জানলেন তাঁরা। আবার ইতিমধ্যে জিন কেটে নেওয়া এবং জিন অন্য জীবের ক্রোমোজোমে জুড়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমও তাঁরা খুঁজে নিতে পারলেন। এমনকি জিনের সঠিক প্রকাশ ঘটানোর জন্য জিনের মধ্যে কোনো রূপান্তর করার প্রয়োজন হলে সেটি করতেও সক্ষম হলেন বিজ্ঞানীরা।

জিনকে এখন মানুষ চিনতে পেরেছে অনেকটাই পরিপূর্ণরূপে। অনুপুঙ্খভাবে এর গঠন আর কাজের ধরন অনেকটাই মানুষের আয়ত্তে এসেছে। অধরা জিন এখন আর অধরা নয়। জিনকে এখন শনাক্ত করে নেওয়ার কৌশল মানুষের হাতে রয়েছে। নির্দিষ্ট জিনকে হাজারো জিনের ভেতর থেকে আলাদা করে নেওয়া যাচ্ছে। কোনো উপযুক্ত পোষকের মধ্যে জিন ক্লোনিং করে বা পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন তথা PCR কৌশল প্রয়োগ করে অবিকৃত অবস্থায় জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাচ্ছে। জিনকে ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য জিন বা জেনোম লাইব্রেরি তৈরি করে এদের এখন সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। বহু জিনের এখন লাইব্রেরি রয়েছে পৃথিবীতে। প্রয়োজনের সময় সে জিনকে লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করা যাচ্ছে। একে এখন নানা রকম উপযুক্ত বাহকে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। বাহকের মাধ্যমে জিনকে কাঙ্ক্ষিত জীবকোষে পৌঁছে দেওয়াও এখন আর অসম্ভব নয়। এসব জিন জীবদেহের কোষের ডিএনএর মধ্যে চমৎকারভাবে সংযোজিত হয় এবং এর চমৎকার প্রকাশও ঘটে। এভাবে এক জীবের জিন অন্য জীবে স্থানান্তর করে কত রকম সুফলইনা পেতে শুরু করেছে মানুষ।

জিনপ্রযুক্তির কাটাছেঁড়া করার ছুরি কাঁচি হলো নানা রকম এনজাইম। নানা রকম ব্যাকটেরিয়ার নানা রকম স্ট্রেইন থেকে বিজ্ঞানীরা এসব এনজাইম সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। এদের 'রেস্ট্রিকশন এনজাইম' বলা হয়। ডিএনএর বড় সুনির্দিষ্ট স্থানে কেটে দিতে পারে এসব এনজাইম। বিজ্ঞানীদের যতটুকু ডিএনএ সিকুয়েন্স বা অংশ কেটে নেওয়া প্রয়োজন ততটুকুই কেটে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে এর মাধ্যমে। আবার বাহকের মধ্যেও জিন কাটাছেঁড়া করে তবে সংগৃহীত ডিএনএ খণ্ড বা জিনকে বাহকের নির্দিষ্ট স্থানে সংযোজন করে দেওয়া যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া থেকে পাওয়া আরেক রকম এনজাইম 'লাইগেজ'কে ব্যবহার করে কর্তিত জিনকে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে জিন কাটাছেঁড়া করা এবং একে সংযোজন করার কৌশল এখন বিজ্ঞানীদের হাতে রয়েছে।

জিনের বাহক হলো নানা রকম ডিএনএ অণু। এসব ডিএনএ অণু কখনো নেওয়া হয় ব্যাকটেরিয়া থেকে আবার কখনো নেওয়া হয় ভাইরাস থেকে। ব্যাকটেরিয়া থেকে পাওয়া বাহক ডিএনএকে বলা হয় প্লাজমিড ডিএনএ। এসব বৃত্তাকার প্লাজমিড ডিএনএ ব্যাকটেরিয়ার কোষে বিরাজ করে। এরা ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমীয় ডিএনএর বাইরে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকার ডিএনএ অণু। নিজেরা এরা নিজেদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে পারে। ভাইরাস থেকে পাওয়া বাহককে বলা হয় ফ্যাজ ভেক্টর বা বাহক। কখনো আবার ব্যাকটেরিয়া

ও ভাইরাস থেকে পাওয়া ডিএনএ অণু কাটছাঁট করে পাওয়া যায় হাইব্রিড বাহক। এ রকম একটি বাহকের নাম ফ্যাজমিড ভেক্টর বা বাহক। এখন কৃত্রিমভাবে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ অণু এবং মানুষের ডিএনএ অণুকে রূপান্তর করে কৃত্রিম বাহকও সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাহকের মাধ্যমে কোনো এক বা একাধিক জিন এক জীব থেকে অন্য কোনো জীবদেহের কোষ বা টিস্যুতে সংযোজন করার কৌশল মানুষের জানা সম্ভব হয়েছে। নির্দিষ্ট জীবের কোষ বা টিস্যুকে উপযুক্ত কালচার মিডিয়ায় কালচার করে এর মধ্যে এখন মিশিয়ে দেওয়া হয় কাঙ্ক্ষিত জিনবাহী বাহককে। এসব বাহক জিনসহ টিস্যু কালচার মিডিয়ায় জন্মানো কোষ বা টিস্যু ভেদ করে ঢুকে যায় জীবকোষের ভেতর। অতঃপর জীবকোষে বিদ্যমান ডিএনএ অণুতে এরা বহন করা জিনকে অনুপ্রবিষ্ট করে দেয়। এসব কাঙ্ক্ষিত জিন অতঃপর সংযোজিত হয়ে যায় জীবের জেনোমে। সময় এলে জীবের পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পন্ন হলে জীবে প্রকাশ পায় এসব জিন। জিন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবে ফুটে ওঠে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অথবা যে কাজের জন্য এর কদর, সে কাজটি সম্পন্ন করে জিন।

এ রকম এক জীব থেকে অন্য জীবে জিন স্থানান্তর এখন এক নিয়মিত কর্মকাণ্ডের অংশ হয়ে পড়েছে পৃথিবীর কোনো কোনো ল্যাবে। এ কেবল নেশার জন্য জিন স্থানান্তর নয়। নিয়মিত মানুষের কাজে লাগছে এসব প্রযুক্তি। আর এটা সম্ভব হচ্ছে কারণ সব জীবের ডিএনএ অণুর গঠনের প্রাথমিক উপাদানগুলো একই রকম। আর এদের তথ্য বহনকারী নাইট্রোজেন বেজগুলো একই। ফলে এক জীবের জিন অন্য জীবে সংযোজিত হতে বা নতুন স্থানে এদের কাজ শুরু করতে কোনো বাধা নেই। জীবজগতের সব জীবের এই মিলটুকুর কারণেই আজ নানা রকম চমক সৃষ্টি করছে জিনপ্রযুক্তি।

সাধারণ প্রক্রিয়ায় যেসব জিন এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে, এক গণ থেকে অন্য গণে বা এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রের জীবে কিংবা এক জীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবে স্থানান্তর করা যায় না, সেসব জিন জিনপ্রযুক্তি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করে গবেষণাগারে জীবের কোষে সংযোজন করা হয়। এ রকম জিনকে ট্রান্সজিন বলা হয়। এক জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট কাঙ্ক্ষিত জিন অন্য জীবে সংযোজন, জিনটির জেনোমের মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থান লাভ এবং জীবটিতে সে জিনটির প্রকাশ সাধন মিলে যে প্রক্রিয়া একে বলা হয় জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন বা জেনেটিক রূপান্তরণ। আর যে জীব অন্য জীবের জিনটিকে ধারণ করল একে বলা হয় ট্রান্সজেনিক জীব। গাছ হলে তা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ আর প্রাণী হলে তা ট্রান্সজেনিক প্রাণী।

ফসলের ফলন বৃদ্ধি করার জন্য নানা রকম রোগশোক ও কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করার কাজটি খুব সহজ নয়। কীটনাশক বা বালাইনাশক প্রয়োগের কারণে পরিবেশ ও জীবকুলের জন্য বহুমাত্রিক ক্ষতির বিষয় আমাদের অজানা নয়। সনাতন উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতিতে কেবল ফসলের নিজস্ব প্রজাতির মধ্যে জিন বিনিময় করার সনাতন কৌশলই যথেষ্ট নয়। বরং কখনো কখনো ফসলের অন্য প্রজাতি বা গণ থেকে কিংবা কখনো অন্য জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন এনে ফসলে সংযোজন করতে হয়। সব জীবের ডিএনএর গঠন একরকম হওয়ায় এক জীবের জিন অন্য জীবে স্থানান্তর করা এবং কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হয়। বাস্তবে ফসলে এ রকম জিন সংযোজনের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা জিএম ফসল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এদের কোনো কোনোটা কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী তো কোনোটা আবার আগাছানাশক

প্রতিরোধী। কোনো কোনো ফসলে আবার কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জিনের পাশাপাশি এতে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিনও সংযোজন করা হয়েছে। এতে ফসলে এখন কীটপতঙ্গ ও আগাছানাশক উভয় রকম প্রতিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছে।

নানা কৌশল অবলম্বন করে গবেষণাগারে জিনকে উদ্ভিদকোষে সংযোজন করে নিতে হয়। কখনো জিনকে কোনো বাহকের মাধ্যমে কোষে সংযোজন করতে হয়, কখনো আবার বাহক ছাড়া সরাসরি জিনকে কোষে সংযোজন করে নিতে হয়। বাহকের মাধ্যমে জিনকোষে সংযোজন করতে হলে Agrobacterium tumefaciens ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডকে ব্যবহার করা হয়। প্লাজমিড হলো ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ ক্রোমোজোমের থেকে আলাদা ডিএনএ অণু। এরা হলো ব্যাকটেরিয়া কোষে বিদ্যমান একাধিক স্বপ্রজননক্ষম বৃত্তাকার ডিএনএ, যা কিনা এর নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত জিন প্রাকৃতিক উপায়ে অন্য জীবে স্থানান্তর করতে পারে। প্লাজমিডের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত জিনকে নির্দিষ্ট স্থানে সংযোজন করে তা পুনঃব্যাকটেরিয়ার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেসব জিনবাহী ব্যাকটেরিয়াকে নির্দিষ্ট উদ্ভিদের টিস্যু কালচার করা মিডিয়ায় জন্মানো টিস্যুর সঙ্গে একত্রে কালচার করা হলে ব্যাকটেরিয়াবাহিত জিনটি উদ্ভিদকোষের জেনোমে ঢুকে যায় প্লাজমিড থেকে।

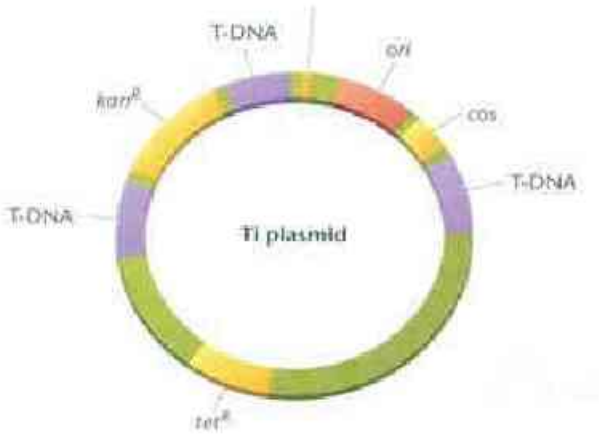

উদ্ভিদে ক্লোনিং করার জন্য তৈরি করা Ti প্লাজমিড

বাহক ছাড়াও কখনো আবার বৈদ্যুতিক আবেশন দ্বারা কোষের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে কোষে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় জিন। কখনো জিন বন্দুক ব্যবহার করে টাংগস্টেন কণায় জিন জড়িয়ে দিয়ে তা সংযোজন করা হয় কোষে। কোনো কোনো সময় গাছের বর্ধনশীল পুষ্পীয় বিটপে জিন মিশ্রিত দ্রবণ ইনজেকশন দিয়ে গাছে জিন সংযোজন করার গঠনাও ঘটে থাকে। যান্ত্রিক কৌশলে কখনো আবার ভ্রূণ, ডিম্বক, প্রোটোপ্লাস্ট বা কোষে সরাসরি সংযোজন করা যায় জিন। রাসায়নিক পদার্থ যেমন পলিইথাইলিন গ্লাইকল প্রয়োগ করে কোষ ঝিল্লিতে অণুছিদ্র সৃষ্টি করেও কখনো কখনো জিন সংযোজন করা হয় জীবে। ট্রান্সজিন জীব কোষে সংযোজনই শেষ কথা নয়। একে কোষের মধ্যে স্থায়ীভাবে সংযোজিত হতে হয় এবং এসব কোষ থেকে কৃত্রিম মিডিয়াতে টিস্যু কালচার করে গাছ পুনরুৎপাদন করতে হয়। কোষে ট্রান্স জিন আসলেই সংযোজিত হলো কি না, তা নির্বাচিত মিডিয়াতে কোষ কালচার করার মাধ্যমে আভাস পাওয়া যায়। জিন সঠিকভাবে সঠিক স্থানে সংযোজন হওয়া বড় জরুরি ব্যাপার।

ফসলের ক্ষেত্রে জিএম প্রযুক্তি অনুসরণ করে পাওয়া ফসলকে বলা হয় জিএম ফসল। জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাকটেরিয়ার জিন ফসলে সংযোজন করে তৈরি করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি জিএম ফসল। সাধারণভাবে ব্যাকটেরিয়ার জিন ফসলে সংযোজন করার কথা নয়। ফসলের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাসগত দূরত্ব অনেক বেশি। সাধারণভাবে কোনো কারণেই এদের মধ্যে জিন বিনিময় ঘটার কথা নয়। ব্যাকটেরিয়া জিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাকটেরিয়ার নির্দিষ্ট জিন ফসলে সংযোজন করার মধ্য দিয়ে জিন দেওয়া-নেওয়ার প্রাকৃতিক সীমা অতিক্রম করে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন নতুন জাত। এসব উদ্ভিদ নানা কঠিন নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাণিজ্যিকভাবে আবাদের লক্ষ্যে নতুন জিএম জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে সেসব জিএম জাতের আবাদ হচ্ছে আর দিন দিন বাড়ছে এর আবাদি এলাকার বিস্তৃতি।

পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিস্টাল প্রোটিন জিনকে আলাদা করে নিয়ে জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে তা সংযোজন করা হয়েছে তুলা, ভুট্টাসহ আরও কয়েকটি ফসলে। এসব জিএম জাতে সংযোজিত জিন ক্রিয়ার ফলে তৈরি হচ্ছে ক্রিস্টাল প্রোটিন। এসব জিএম জাতে পোকার আক্রমণ ঘটলে গাছের রসের সঙ্গে পোকার মুখে চলে আসে এসব ক্রিস্টাল প্রোটিন। অতঃপর পোকার এনজাইম দিয়ে এসব প্রোটিন ভাঙা মাত্রই শুরু হয় এদের বিষক্রিয়া। আর তাতেই পোকার কোষ ভেঙে যায়। ফলে একসময় মারা যায় পোকা। এভাবেই কীট-প্রতিরোধী জিএম জাত ফসলকে রক্ষা করে পোকার হাত থেকে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে উদ্ভাবন করা হয়েছে বেগুনের বিটি জাত। *Bacilus thurengiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে জিন নেওয়ায় এদের নাম হয়েছে বিটি বেগুন। এ রকম বিটি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে তুলা, ভুট্টা, সয়াবিন ইত্যাদি ফসলেও।

জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে উদ্ভাবিত বিটি বেগুন

ফসলের মাঠে গজানো আগাছা নির্মূল করার কৌশল হিসেবে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে পৃথিবীর বেশ কটি ধনী দেশে। ব্যাকটেরিয়া থেকে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন সংযুক্ত করা হয়েছে ফসলে। এসব ফসলে আগাছা নির্মূলের লক্ষ্যে আগাছানাশক স্প্রে করা হয় ফসলের বৃদ্ধির নানা পর্যায়ে। সাধারণভাবে আগাছানাশক আগাছাকে যেমন মেরে ফেলে তেমনি এরা ফসলের গাছকেও মেরে

ফেলে। ফসলের জিএম জাতে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন সংযোজন করার ফলে মাঠে আগাছানাশক স্প্রে করলেও আগাছা মরে যায় কিন্তু অক্ষত থেকে যায় ফসল। এদের মধ্যে সংযোজিত জিন যে এনজাইম তৈরি করে, সেটিই ফসলকে বাঁচিয়ে রাখে। কোনো কোনো জিএম ফসলে এনজাইম বেশি তৈরি হয় বলেই আগাছানাশক সে এনজাইমকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে পারে না। তাই বেঁচে যায় ফসল। আবার অন্য কোনো জিএম জাতে এসব এনজাইম নষ্ট করে দেয় আগাছানাশকের বিষক্রিয়া। ফলে বেঁচে যায় ফসল। আর আগাছা মরে যায় সহজেই, কারণ আগাছার দেহে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন যে নেই। ফসলের আরও কত কত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্যই প্রয়োগ করা হচ্ছে জিনপ্রযুক্তি আজকাল। আর তাতে পাওয়া যাচ্ছে ফসলের নানা রকম জিএম জাত। আর তাতে বাড়ছে এসব ফসলের ফলন।

জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত জিএম তুলা ও জিএম ভুট্টা

মানুষের রোগশোকের চিকিৎসার ওষুধ বা প্রোটিন কিংবা এনজাইম তৈরি করে রীতিমতো বিস্ময়কর সাফল্য এনে দিয়েছে জিনপ্রযুক্তি। পৃথিবীর কত মানুষই-না ডায়াবেটিস রোগে ভুগছে। তাদের দেহে হয় ইনসুলিন তৈরিই হয় না অথবা কিছু পরিমাণ তৈরি হলেও দেহের চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল। সে রকম ক্ষেত্রে রোগীকে ফার্মেসি থেকে ইনসুলিন কিনে দেহে গ্রহণ করতে হয় দেহ রক্ষার কারণেই। জিনপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন সংযোজন করে ব্যাকটেরিয়াকে কারখানা হিসেবে ব্যবহার করে এসব ইনসুলিন এখন তৈরি করা হচ্ছে ল্যাবে। সেসব ইনসুলিন পৃথিবীর কোটি কোটি ডায়াবেটিস রোগীর জীবন রক্ষাকারী ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিদিন।

মানুষের ইনসুলিনের দুটি চেইন রয়েছে। এদের বলা হয় চেইন A ও চেইন B। মানুষের ইনসুলিন তৈরি করার এই দুই রকম চেইনের জিন আলাদা করে নেওয়া হয়েছে মানুষের কোষ থেকে। অতঃপর এসব জিন সংযোজন করা হয়েছে প্লাজমিড বাহকসমূহে। এসব বাহক দুই রকমের জিন বহন করে নিয়ে এসে অতঃপর তা সংযোজন করে দিয়েছে আলাদা আলাদা E.coli ব্যাকটেরিয়াতে। আলাদা কালচার মিডিয়াতে দুই রকমের জিনবাহী *E.coli* কালচার করা হয়। একটিতে জিন ক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় ইনসুলিন A আর অন্যটিতে তৈরি হয় ইনসুলিন B। অতএব দুই রকম ইনসুলিন চেইন মিশিয়ে নিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে পাওয়া যায় মানুষের ব্যবহার্য ইনসুলিন। এসব ইনসুলিন এখন ব্যবহার করছে পৃথিবীব্যাপী লক্ষ কোটি মানুষ। ইনসুলিন

ছাড়াও জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে তৈরি করা হচ্ছে দেহের বৃদ্ধিকারক হরমোন, আলফা ইন্টারফেরন, হেপাটাইটিস B ভ্যাকসিনসহ নানা রকম প্রডাক্ট, যা ব্যবহার করা হচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে।

জিনপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন নিউ জেনারেশন ভ্যাকসিন তৈরির গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রথম উদ্ভাবিত সিনথেটিক ভ্যাকসিন হলো হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ভ্যাকসিন। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধে এই ভ্যাকসিন খুব নিরাপদ ও কার্যকর। ১৯৮৭ সালে এই ভ্যাকসিনটি বাজারজাত করা শুরু হয়। এরপর এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও বেশ কতগুলো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবীয় রোগের বিপক্ষে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এদের কোনো কোনোটা এখন বেশ জনপ্রিয় ভ্যাকসিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কোনো কোনোটার আবার চলছে এখন জীব নিরাপত্তাবিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও। ম্যালেরিয়া, কলেরা, জলবসন্ত, টাইফয়েড এমনি কত রোগের বিপক্ষে তৈরি করা হয়েছে সিনথেটিক ভ্যাকসিন।

কোনো কোনো ফসল বা পশুকে এখন চিকিৎসার কাজে ব্যবহার উপযোগী প্রোটিন তৈরির কারখানা হিসেবে ব্যবহার করার গবেষণা চলছে বেশ জোরেশোরে পৃথিবীর উন্নত দেশের ল্যাবগুলোতে। জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে খরগোশে সংযোজন করা হয়েছে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন করার জিন। ছাগলে সংযোজন করা হয়েছে এমন জিন, যা কিনা তৈরি করবে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এন্টিথ্রমবিন। এমনকি তৈরি করা হয়েছে ট্রান্সজেনিক ইঁদুর, যে কিনা তৈরি করবে মানুষের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার উপযোগী ইমিন্যুগ্লোবিউলিন। গাভিতে সংযুক্ত করা হয়েছে লেকটোফেরিন ও ইন্টারফেরন উৎপাদন করার জিন। এনব ট্রান্সজেনিক প্রাণী কেবল প্রোটিন উৎপাদনের কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তার মানে জিনপ্রযুক্তি এখন মানবকল্যাণে নানা রকম জানালা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। মানুষকে জিনপ্রযুক্তি নিয়ে অবিরত গবেষণার মধ্য দিয়ে সে কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রবন্ধকার : অধ্যাপক, কৌলতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঘরের বাতাস বিশুদ্ধকারী কিছু গাছ

আমিনা বেগম

গাড়ির ধোঁয়া কিংবা কারখানার বর্জ্য প্রতিনিয়ত বাতাসকে করে চলছে দূষিত। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে এই দূষণের মাত্রা খুব বেশি। যার ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘরের বাতাসও এখন আর নিরাপদ নেই। এক গবেষণায় দেখা যায়, ঘরের ভেতরের বাতাস বাইরের বাতাসের তুলনায় ২ থেকে ৫ গুণ বেশি দূষিত হয়ে থাকে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে, বিশ্বে ৩ শতাংশ রোগ ঘরের দূষিত বাতাসের কারণে হয়ে থাকে। তাই আমাদের উচিত ঘরের বাতাস আর পরিবেশকে পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত রাখা। প্রকৃতিতে এমন কিছু গাছ রয়েছে, যা ঘরে রাখলে শুধু অক্সিজেনই পাবেন না, সঙ্গে ঘরের মধ্যে থাকা দূষিত বাতাসও পরিষ্কার করার কাজ করবে। তেমনই কিছু গাছ সম্পর্কে চলুন জেনে নেওয়া যাক।

অ্যালোভেরা : বাংলায় এর নাম ঘৃতকুমারী। আর ইংরেজিতে যাকে Medicinal aloe, Burn plant বলা হয়। এটি Asparagales বর্গের Asphodelaceae গোত্রের রসালো উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Aloe vera*। এই গাছের রস ত্বক ও চুলের পরিচর্যায় কাজে লাগে। তবে এই গাছের এমন একটি গুণ রয়েছে, যা সত্যিই অবাক করার মতো। ঘরের বাতাস বিশুদ্ধ করতেও অ্যালোভেরার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এটি ঘরের ভেতরের বাতাসকে পরিষ্কার রাখে এবং সেই সঙ্গে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে পারে। ঘরের কার্বন মনো-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ফরমালডিহাইডের মতো ক্ষতিকারক পদার্থ শোষণ করে বাতাসকে পরিষ্কার করে দূষণমুক্ত রাখে। মাত্র একটি অ্যালোভেরা গাছ ৯টি বায়োলজিক্যাল এয়ার পিউরিফায়ারের সমান কাজ করে।

বাতাসে ভেসে থাকা ক্ষতিকর কেমিক্যালের মাত্রা যখন খুব বেড়ে যায় তখন অ্যালোভেরার পাতায় ছোট ছোট বাদামি দাগ পড়ে। ফলে ঘরে থাকা বিষাক্ত জিনিসের মাত্রা সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। এই গাছটির খুব বেশি যত্ন নেওয়ার দরকার পড়ে না। ভালো দেখে একটি টবে গাছটি রোপণ করে নিয়মিত পানি দিলেই এটি দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে নেয়। তবে অ্যালোভেরার যত্নে একটি ব্যাপার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। পর্যাপ্ত সূর্যের আলো যেন পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ পর্যাপ্ত আলো পেলেই অ্যালোভেরা গাছ ভালোমতো বেড়ে ওঠে।

ফার্ন : ঘরের বাতাসকে বিশুদ্ধ করতে আরেকটি কার্যকরী গাছ হচ্ছে ফার্ন। টবে লাগানোর জন্য উপযোগী ফার্নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- Oleandraceae, Pteridaceae, Marsileaceae, Adiantaceae

I Salviniaceae গোত্রের সদস্যরা। এদের মধ্যে আমাদের দেশে টবে লাগানোর জন্য বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে Pteris pellucida। এই গাছটি অন্যান্য কেমিক্যালের চেয়ে ফরমালডিহাইড দূর করতে বেশি শক্তিশালী। বিশেষ করে কাঠের আসবাবে থাকা ফরমালডিহাইড দূর করতে এই গাছ খুবই কার্যকরী। এ ছাড়া ক্ষতিকর কেমিক্যাল জাইলিন ও টলুইন দূর করতেও ফার্ন বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে মাটিতে থাকা নানা রকম বিষাক্ত পদার্থ যেমন মার্কারি কিংবা আর্সেনিক দূর করতেও এই গাছ বেশ উপকারী। এই গাছ বড় হয় খুব তাড়াতাড়ি। অপুষ্পক এই উদ্ভিদ ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে কিংবা বারান্দায় রাখা যায়। একটু ভালো আলো-বাতাস পেলে ফার্নগাছ খুবই দ্রুত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তোলে।

ব্যাম্বো পাম : টবে চাষ করা যায় পাম প্রজাতির গাছ হলো ব্যাম্বো। এটি golden cane palm, areca palm, yellow palm, butterfly palm নামে পরিচিত। এটি Arecales বর্গের Arecaceae গোত্রের অন্তর্গত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dypsis lutescens*। এই ঘাসজাতীয় উদ্ভিদগুলো ৩ থেকে ৬ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। মোটামুটি মাঝারি সাইজের একটি টবে ঘরের কোণে এই গাছ লাগানো যায়। ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানোতে এই গাছ যেমন অতুলনীয় তেমনি পরিবেশ রক্ষায়ও সমান কাজ করে। ট্রাই ক্লোরোইথিলিন, বেনজিনসহ আরও বেশ কিছু ক্ষতিকর বিষাক্ত কেমিক্যাল দূর করে বাতাসকে বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে এই উদ্ভিদ।

এই উদ্ভিদের যত্ন অন্য সব গাছের মতো করে নেওয়া যাবে না। সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এই গাছটিকে থাকতে পারে না। আলো আছে কিন্তু সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না, এমন স্থান এই উদ্ভিদের জন্য উপযুক্ত। টবের মাটি সব সময় ভিজিয়ে রাখতে হবে পানি দিয়ে। পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য তরল সার দিতে হবে মাসে একবার।

স্নাক প্ল্যান্ট : বেডরুমে রাখার জন্য সব থেকে আদর্শ গাছ হলো স্নাক প্ল্যান্ট। এটি Asparagales বর্গের Asparagaecae পরিবারের অন্তর্গত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Sansevieria trifasciata*, এটি snake plant, mother-in-law's tongue, and viper's bowstring hemp নামে পরিচিত। অফিস কিংবা রেস্টুরেন্টে এই গাছটি প্রতিনিয়ত দেখা যায়। এ গাছ সহজে মরে না। বিশেষ আলো বা পানিরও প্রয়োজন পড়ে না। মাঝে মাঝে পানি দিলেই চলে। শুকনা স্থানে এই গাছ হয়ে থাকে। অল্প আলোতেও বেঁচে থাকতে পারে। এ ছাড়া এ গাছ অন্ধকার এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ জায়গায় ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে। তাই

অনেকে এই গাছকে টবে রোপণ করে বাথরুম বা এর আশপাশে রেখে দেন। ঘরে জমে থাকা টক্সিন পরিষ্কার বা অক্সিজেন সরবরাহ তো করেই। এর থেকেও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হলো রাতেও এরা ঘরের মধ্যে অক্সিজেন ছাড়ে। ঘরের ভেতরের বাতাসে থাকা বেনেজন, ফরমালডিহাইড, ট্রাইক্লোরোইথিলিন ও জাইলিন নামক বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাসকে দূর করে স্নেক প্ল্যান্ট। বিশেষ করে ফরমালডিহাইড আর কার্বন মনোক্সাইড দূর করতে এই গাছের জুড়ি নেই। তবে এই গাছের পাতা যতই ধারালো হোক এর সবচেয়ে বড় গুণ হলো রাতে এই গাছ অক্সিজেন সরবরাহ করে বেশি। ঘুমের পরিবেশকে ভালো রাখতে শোবার ঘরে এই গাছ রাখেন অনেকেই।

মানি প্ল্যান্ট : মোটামুটি পরিচিত একটি গাছ মানি প্ল্যান্ট। এটি Alismatales বর্গের Araceae গোত্রের অন্তর্গত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Epipremnum aureum*। এই গাছটি শুধু মাটিতে কিংবা পানিতে লাগাতে পারেন। দ্রুত বেড়ে উঠে আর অনেক সহজেই সংগ্রহ করা যায় বলে এই গাছটির চাহিদা রয়েছে সবার কাছেই। গাছটি উজ্জ্বল আলোতে ভালো বাড়লেও অন্ধকারেও এই গাছ একই রকম সবুজ থাকে। ঘরের শোভা বাড়াতে এই গাছ বেশি ব্যবহার করা হয়। অনেকে অফিসের টেবিলেও যত্ন করে রাখেন এই গাছটিকে। একটি কাচের জারে পানি দিয়ে রেখে দিলেই এই গাছ আপনাআপনি বেড়ে ওঠে। তবে অনেকেই হয়তো জানেন না এই গাছটি ঘরের পরিবেশকে রাখে বিশুদ্ধ। বিশেষ করে ক্ষতিকারক ফরমালডিহাইড দূর করতে এই গাছ বেশ ভালো ভূমিকা রাখে।

ক্যাকটাস : ক্যাকটাস গ্রিক শব্দ, ক্যাকটোস শব্দ থেকে এসেছে। পরে এর নাম রাখা হয় ক্যাকটাস। যার অর্থ 'কাঁটা ভরা'। এরা Carzophallales বর্গের Cactaecae গোত্রের অন্তর্গত। এটি মরুভূমির গাছ। বিশ্বে প্রায় ২৫০০-এর বেশি প্রজাতির ক্যাকটাস আছে। আমাদের দেশে টবে লাগানোর উপযোগী কয়েকটি ক্যাকটাস হলো একাইনো ক্যাকটাস, এপিফাইলাম, নিপল ক্যাকটাস, সেরেয়াস, গোল্ডেন ব্যারেল, ওল্ড লেডি,

মাদার-ইন-ল-চেয়ার, সেরিয়াস, ফণীমনসা ইত্যাদি। কাঁটাযুক্ত এই গাছটিও আপনি খুব সহজে ঘরে রাখতে পারেন। এটি ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আবার খুব বেশি যত্নেরও প্রয়োজন পড়ে না। নানা রকমের ক্যাকটাস কিনতে পাওয়া যায় নার্সারিগুলোতে। এই গাছটি বারান্দা কিংবা জানালার পাশে খুব সহজে রেখে দিতে পারেন।

স্পাইডার প্ল্যান্ট : চিকন চিকন পাতার এই গাছটি ঘরের জন্য হতে পারে একটি আদর্শ গাছ। নিয়মিত পানি দিলে আর বারান্দায় রাখলেই এই গাছ সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে। সাদা আর সবুজের সংমিশ্রণের এই গাছটির পাতাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে থাকে বলে এটিকে স্পাইডার প্ল্যান্ট বলা হয়ে থাকে। ছোট-বড় প্রায় সব নার্সারিতেই এই গাছটি পাওয়া যায়। আর এই গাছের দামটাও আছে হাতের নাগালের মধ্যেই। নাসার (National Aeronautics and Space Administration-NASA) মতে, এই গাছ ঘরের শতকরা ৯০% দূষিত বাতাস বিশুদ্ধ করে। স্পাইডার প্লান্টের উৎপত্তিস্থল সাউথ আফ্রিকায়। এই গাছের বোটানিক্যাল নাম Chlorophytum composing। সরু এই গাছটি সাধারণত ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাতার রং সবুজের মধ্যে সাদা ডোরা কাটা। তবে মাঝে মাঝে শুধু সবুজও হয়। গাছ থেকে বের হয় ছোট ডাল, ডালের মাথায় ফুটে সাদা সাদা ফুল। ফুল থেকে হয় ছোট্ট চারা গাছ।

উইপিং ফিগ প্ল্যান্ট : উইপিং ফিগ প্ল্যান্ট, দক্ষিণ এশিয়ায় এ গাছটি বেশ জনপ্রিয়। এগুলো weeping fig, benjamin fig or ficus tree নামে পরিচিত। এরা Rasales বর্গের Moraceae গোত্রের অন্তর্গত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Ficus benjamina*। অল্প আলো, স্বল্প জায়গার মধ্যে গাছটি বেড়ে উঠতে পারে। এ জন্য খুব বেশি ঝামেলা হয় না। সিগারেটের কারণে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে কাজ করার এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে এই গাছটির। যারা ঘরে ধূমপান করেন, তাদের ঘরের বাতাস দূষণমুক্ত করার জন্য এই গাছটি বেশ কার্যকর। এটি কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ দূর করে থাকে। তাই আপনার বাড়িতে বা ঘরে বসে ধূমপান করার মতো যদি কেউ থাকেন যে কিনা কোনো বাধাই মানেন না। তার পেছনে সময় নষ্ট না করে আপনার ঘরে নিয়ে আসুন উইপিং ফিগ প্ল্যান্ট। বাড়ির বাতাস ও অন্যদের সুরক্ষার জন্য এই গাছ আপনাকে অনেক সাহায্য করবে।

রোজমেরি : রোজমেরি (বৈজ্ঞানিক নাম *Rosmarinus officinalis*), (ইংরেজি: rosemary), হচ্ছে একটি কাষ্ঠল, ঘ্রাণযুক্ত গুল্ম, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের স্থানীয় উদ্ভিদ। Lamiaceae পরিবারের এটি সদস্য। রোজমেরি নামটি এসেছে লাতিন শব্দ 'শিশির' (ros) এবং 'সমুদ্র' (marinus), বা 'সমুদ্রের শিশির' থেকে বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য এই হার্বের ব্যবহার হয়। খাবারের সুগন্ধ বৃদ্ধি করা ছাড়াও এটি মশা-মাছি ও কীটপতঙ্গ তাড়া করে। এ ছাড়া কম আলোতে সহজেই বেড়ে উঠতে পারে তাই ঘরে টবে লাগানো হয়। কিন্তু অনেকেই জানে না রোজমেরি সুঘ্রাণ সহজেই আপনাকে ঘুমিয়ে পড়তেও সাহায্য করে। এছাড়া দেখা গেছে রোজমেরি নার্ভাস সিস্টেম, হার্ট ভালো রাখতেও সাহায্য করে। রোজমেরির পাতায় ভীষণ সুঘ্রাণ থাকে, অনেকে মাংসের ভেতর দিয়ে থাকেন এ কারণে। এর পাতা দিয়ে শ্যাম্পু তৈরি করা যায়, যা চুলের জন্য খুব উপকারী। কিছুদিন ধরে মাখলে সাদা চুলগুলো কিছুটা কালো হতে থাকে। এর অর্গানিক তেল লাগাতে পারলে চুলের অধিকাংশ সমস্যা চলে যায়, চুল পড়া বন্ধ হয়, চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। অনেকে এর পাতা দিয়ে চা খেয়ে থাকেন, যা বেশ সুস্বাদু।

চন্দ্রমল্লিকা : চন্দ্রমল্লিকা (ইংরেজি: Chrysanthemum; বৈজ্ঞানিক নাম: *Chrysanthemum indicum L.*) একটি অতি পরিচিত ফুল। এই ফুলের অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে। এটি বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয়। বিভিন্ন রঙের এই ফুলগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমূল্য প্রথম সারিতে রয়েছে। অক্টোবরে কুঁড়ি আসে এবং নভেম্বরে ফুল ফোটে। গাছে ফুল তাজা থাকে ২০ থেকে ২৫ দিন। ফুলদানি সাজানোর জন্য লম্বা ডাঁটাসহ এবং মালা গাঁথার জন্য ডাঁটা ছাড়া ফুল তোলা হয়। অন্যান্য স্থানীয় নামের মধ্যে চন্দ্রমুখী, chrysanthemum, Gul dawoodi উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রমল্লিকার ইংরেজি প্রতিশব্দ ক্রিস্যানথিমাম। শব্দটি গ্রিক থেকে এসেছে। ক্রিসস অর্থ 'সোনা' এবং এনথিমাম অর্থ 'ফুল উজ্জ্বল বিভিন্ন রং নিয়ে শীতে জন্মায় চন্দ্রমল্লিকা। আপনার ঘরকে সুসজ্জিত করার সঙ্গেই ঘরে জমে থাকা বেনজিন, যা আঠা, রং, ডিটারজেন্ট ও প্লাস্টিকের সঙ্গে আসে, তাকে ফিল্টার করে। এই গাছ উজ্জ্বল আলো ভালোবাসে, এর কুঁড়িকে ফুটতে সাহায্য করে সূর্যের সরাসরি আলো। তাই একে রাখতে পারেন ঘরের সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো দেওয়া জানালাটির কাছে। আপনি যদি গৃহসজ্জার সঙ্গে মিলিয়ে গাছ লাগাতে চান, তবে চন্দ্রমল্লিকা হতে পারে

আপনার প্রথম পছন্দ। নীল বাদে প্রায় সব রঙের ফুলগাছের জাত আছে চন্দ্রমল্লিকার। কিন্তু গাছ কেনার সময় লক্ষ রাখবেন যেন বাগানে লাগানোর গাছ না কিনে ফেলেন, এর বাগান আর ঘরের জাত আলাদা।
মনোরম ও সুস্থ পরিবেশে জীবনযাপনের জন্য বেশি বেশি গাছ লাগানো প্রয়োজন। তাই আমরা ঘরের ভেতরে ও বাইরে বেশি গাছ লাগাব। আর ঘরের ও বাইরের সুস্থ পরিবেশে এ জীবনযাপন করব।

Ref.

1. Farooqi, A. A. and Sreeramu, B. S. (2001) Cultivation of Medicinal and Aromatic Crops. Orient Longman, India.
2. Howell, J.T., P.H. Raven & P. Rubtzoff. 1958. Flora of San Francisco. Wasmann J. Biology
3. Plants of the World Online. Royal Botanic Gardens, Kew. Retrieved
4. Wikipedia

প্রবন্ধকার : প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ, মৌলানা মুফাজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজ, রাজনগর, মৌলভীবাজার।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান জাদুঘরের নতুন আকর্ষণ

যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ
ও
নতুনত্বে ভরা মিউজিয়াম বাস

অনলাইনে নিম্নোক্ত http://nmst.sobticket.com/ এই লিংকে টিকিট পাওয়া যাবে

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

www.nmst.gov.bd

যোগাযোগঃ ০২-৫৮১৬০৬১২, ০২-৫৮১৬০৬১৬

মোবাইলঃ ০১৩০৯-৩১৩০৬১